পঞ্চম অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের পরিণতি ও পরবর্তী সাহিত্যধারায় প্রভাব

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের পরিণতি ও পরবর্তী সাহিত্যধারায় প্রভাব

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। সেই তাগিদেই বাংলা সাহিত্য-জগতে এক একটি সাহিত্য-আন্দোলন এসেছে, এক একটি বাঁকবদল এসেছে। যে তাগিদে এই সাহিত্য আন্দোলনগুলির সূত্রপাত ঘটেছিল, আবার সেই তাগিদেই এগুলির অবসানও ঘটেছে। গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য আন্দোলন মাত্রেই একটা জায়গায় থামতে বাধ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট লেখকরা থামেন না; রূপান্তরের পথে এগিয়ে যান। স্বধর্ম থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন, নাকি বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ ধরেই এগোলেন – তা'ই দেখার। এছাড়া এই সাহিত্য আন্দোলনগুলি পরবর্তী সাহিত্য ধারায় কতটা প্রভাব বিস্তার করল, আধুনিক সাহিত্যের গতিপথ নির্মাণে কতটা অংশগ্রহণ করল, তা বিচার্য বিষয় এই অধ্যায়ে।

১। হাংরি

যাত্রা শুরুর পর থেকেই হাংরি আন্দোলন বারবার নানা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক বেঁকেচুরে এগিয়েছে এই আন্দোলনের পথ। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে পাটনা থেকে ছাপা ইংরেজিতে প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশের পর থেকে অনেকটা পথপরিক্রম করে কলকাতা হয়ে সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এই আন্দোলন। এই ব্যাপক বিস্তার একদিকে গর্বের বিষয় ঠিকই, কিন্তু এখানেই নিহিত ছিল এই আন্দোলনের মৃত্যুবাণটি। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' যেভাবে হয়, ঠিক তেমনভাবেই অতি বিস্তারের মাধ্যমেই এই আন্দোলন খানিকটা কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। আন্দোলন শুরুর সময়ে বলা হয়েছিল, আত্মজিজ্ঞাসার কথা, আত্ম-উন্মোচনের কথা এবং সেই কথা বলতে গিয়ে কোনো নিয়ম না মানার কথা। নিয়ম না মেনে তাঁরা যা করলেন, সেগুলিকেই অনেকে নিয়ম ভেবে লিখতে বসলেন। এখানেই মূল সমস্যা। হাংরিরা কখনও

যৌনতার চর্চা করেননি; হাংরিদের আত্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে কখনো কখনো তথাকথিত যৌনতা এসেছিল, এটাকেই কেউ কেউ নিয়ম ভেবে যৌনতাকে বিষয় করে লিখতে বসলেন হাংরি লেখা। আত্মিক ক্ষুধা ধীরে ধীরে রূপ পেল জৈবিক ক্ষুধায়, যা মলয় রায়চৌধুরী সৃষ্ট হাংরি আন্দোলনের বিষয়ই নয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন' শীর্ষক লেখায় বলেছেন, "এঁদের হাঙ্গার জীবনকে নগ্ন করে ভাঁজ খুলে খুলে দেখার – তাতে যত ভয়ংকরই প্রকাশ পাক ক্ষতি নেই। জীবনের যাবতীয় রিলেসন, আচার এবং যুক্তিশৃঙ্খল যদি ভণ্ডামি বলে প্রমাণিত হয়, তাকে এঁরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করবেন। এবং এঁরা এসব কিছুকে প্রতারণা বলেই ভাবেন। সবরকম এসট্যাবলিশমেন্ট এঁদের কাছে দুরারোগ্য ক্যান্সারে অধিকৃত বলে মনে হয়, এবং এই বীজানু বলয়ের বাইরে এঁরা পা ফেলতে চান। পূর্ববর্তী যাবতীয় শিল্পকর্মও এঁদের কাছে মূঢ়তার বিশ্বকোষ মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন অবসেসনের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে, বুদ্ধি ও যুক্তির বুর্জোয়া গণিতকে প্রহারে প্রহারে অথর্ব করে সভ্যতার বিচিত্র রাংতার পলেস্তার নোনা আচ্ছাদন আঁচড়ে তুলে ফেলে এঁরা নিজেদের আত্মায় নিজের তর্জনী স্থাপন করে চতুর্দিকে তাকাতে চেয়েছেন। অভিজ্ঞতার দর্পনে যতটুকু মুখচ্ছবি ঠিক ততটুকুকেই এঁরা পৃথিবীর আয়তন মনে করেন, এবং ততটুকুকেই সাহিত্যের চৌহদ্দি ভাবেন। এর বাইরে কিছু হয় না, হতে পারে না; যা হয়েছে তা ভুল, যা হবে তা ভণ্ডামির কারসাজি। নিজের সঙ্গে এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের ভাবনা নিরর্থক – যুদ্ধটাই সব, যুদ্ধ থেমে যাবার অর্থই মৃত্যু। ... নিজের অস্তিত্বের ভিতরে গর্জন করে ঢুকে যাবে, ভিতরটাকে ভেঙে-ফাটিয়ে যথার্থ আর্তনাদগুলিকে প্রকাশ করবে এবং আক্রমণে সজাগ রক্তকণিকা explode করে বাইরে আসবে – এই exploded red corpuscles–ই অক্ষরে রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যের শব্দ এবং ভাষা বলে চিহ্নিত হবে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আত্মার intimate এবং naked সংঘর্ষে যে কটি শব্দ এই সাহিত্য তার বাইরের যেকোনো অভিধানকেই ব্যান করবে – এ-প্রসঙ্গে শব্দের শ্লীলতা অশ্লীলতারও কোনো মার্কা নেই, জীবন যেভাবে react করবে শব্দ তার সমানুপাতিক হবে। শব্দ আসলে রিয়াকসনের Sound effect – ভাষা ও বাক্য তার পুঞ্জীভূত রূপ মাত্র। সব মিলিয়ে জীবনের কর্দম ও চন্দনের মধ্যে স্ট্রেইট ড্রাইভ। যাবতীয় এসট্যাবলিশমেন্ট বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে সবল প্রতিরোধ এবং আত্মাকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আক্রমণেরও প্রয়োজন। এক কথায় জীবন ও লেখায় অরিজিনাল হয়ে ওঠা। এইভাবে আত্মার ক্লিষ্টতাকে আহার জোগাবার জন্যেই ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত সমাজ। অর্থাৎ হাংরি জেনারেশন।"[১] মলয় রায়চৌধুরীর হাতে সৃষ্ট এই হাংরি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ১৯৬৪ সালেই। কারণ এই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'

কবিতাটির জন্য অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়; 'কলকাতার পুলিশ পাটনায় গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ইন্সপেক্টররা রিকশায় বসলেন এবং মলয়কে হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে চোর ডাকাতের মতন রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে বহু লেখাপত্র নষ্ট করে দেওয়া হল। ফাইল, বইপত্র, টাইপরাইটার ইত্যাদি বগলদাবা করে কলকাতায় নিয়ে গেল লালবাজার পুলিশ, যা আর পরে ফিরে পাননি।'[২] এই সময়ে বিপদ বুঝে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে মুচলেকা দিয়ে অনেকেই কেটে পড়েন, যে কারণে মলয় রায়চৌধুরী বলেন ১৯৬৪ তে এই আন্দোলন ফুরিয়ে যায়। অবশ্য কিছুদিন পরেই তাঁর সেই বন্ধুরা আন্দোলনের স্রষ্টার দাবিদাওয়া নিয়ে আবার আসরে নামেন, হাংরি শব্দকে বর্জন করে 'ক্ষুধার্ত' নাম নিয়ে। আর এই 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার সংকলনই আজ বাজারে বিকোয় হাংরি সংকলনের ছদ্মবেশে। খুবই দুঃখজনক যে, হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস না জানা সাধারণ পাঠক 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা পড়ে, আর হাংরি সাহিত্য বিচার করে। 'হাংরি' ও 'ক্ষুধার্ত'-এর পার্থক্য তাঁদের কাছে বোধগম্য নয়। 'ক্ষুধার্ত' ছাড়াও দ্বিতীয় দফায় এই আন্দোলনটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস দেখা যায় মলয় রায়চৌধুরীর 'জেব্রা' পত্রিকায়, যে পত্রিকার দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-৬৭তে, এছাড়াও 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ফুঃ' ইত্যাদি পত্রিকার কথা বলা যেতে পারে।

'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির জন্য আদালতে দিনের পর দিন হাজিরা দিয়েছেন কবি মলয় রায়চৌধুরী। হাস্যকর হলেও সত্যি, এদেশের আইন বিচার করেছে কবির সেই কবিতাকে, যে কবিতাটি পরবর্তীকালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড 'স্টার্ক ইলেকট্রিক জেসাস' নামে, যেটি প্রকাশ পায় ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। তাই ১৯৬৫ তে যখন তাঁর 'জখম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন তাতে শোনা গেলো এক অনন্ত ক্ষুব্ধ আহত অস্থির কণ্ঠের স্বর। আহত এক কবি তাঁর ক্ষতচিহ্নগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জখম ভর্তি কবি-হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়েছে এই দীর্ঘ কবিতাটি। আমরা জানি, মামলা চলাকালে শৈলেশ্বর ঘোষের জবানবন্দী পরবর্তীকালে মলয় রায়চৌধুরীর ঘৃণা ও ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। দু'জন দু'জনের প্রতি কোমর বেঁধে আক্রমণাত্মক হয়েছেন। আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণে বেঁচে থেকেছে তাঁদের সম্পর্ক। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হাংরি আন্দোলন ধীরে ধীরে স্রোত হারিয়েছে এভাবেই। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাংরি আন্দোলনের মতো ব্যাপক বিস্তারী সাহিত্য-আন্দোলন বাংলায় আর চোখে পড়ে না। 'ক্ষুধার্ত'-এর ষষ্ঠ সংকলনে

শৈলেশ্বর ঘোষ 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ও আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য' শীর্ষক লেখায় বলেছেন –

> হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষার তরুণ কবি-লেখকদের জাগিয়ে তুলেছিল। গোটা দেশের উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও প্রচার মাধ্যমগুলি দারুনভাবে রিয়্যাক্ট করতে বাধ্য হয়েছিল। বোঝা যায় ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটাকে এই আন্দোলন প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, যা আগে কেউ সচেতনভাবে করতে পারেনি। বহির্বিশ্বে, ইংরাজি, আমেরিকান, ফরাসি, জার্মান, ল্যাটিন আমেরিকান ও অস্ট্রেলীয় সাহিত্য জগতে এই আন্দোলন গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের পরিচিতির পর – হাংরি জেনারেশন আন্দোলনই সারা পৃথিবীর সামনে বাংলা সাহিত্যকে আবার তুলে ধরে।
>
> (ক্ষু স, পৃ.৪৭৪)

অস্বীকার করার উপায় নেই একটি কথাও। এঁদের রচনা নিয়ে যে ভয়ঙ্কর বিতর্ক, ঝড়, পুলিশি নির্যাতন হয়েছিল, তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে এদের ক্ষমতার প্রকাশ। আছে বলেই প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রচন্ড। প্রচলিত সাহিত্য ধারণার মূলে এঁরা কুঠারাঘাত করেছেন। 'শব্দ ও সত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি শঙ্খ ঘোষের বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য, "কবিতালেখার অপরাধে এই শহরের কয়েকজন যুবককে যে একদিন হাজতবাস করতে হয়েছিল, এটা আজ ইতিহাসের বিষয়। কবিতালেখার অপরাধে? না, বিজ্ঞ সামাজিকদের বিবেচনায় সে-লেখাগুলি একেবারেই কবিতাপদবাচ্য ছিল না, কেননা তার মধ্যে ছিল না কোনো শিল্পরুচির আভাস। অথচ এ-যুবকেরা প্রথমেই জানিয়েছিলেন যে শিল্প নামে কোনো অলীক কাণ্ড নেই কোথাও, ওটা আর কোনো দৈবসূত্রে-পাওয়া সাজানো-গোছানো বিলাসব্যাপার নয়, জীবনযাপনেরই সত্য প্রকাশ হলো কবিতা। প্রকাশের এই ধরনকে নীতিবাহকেরা যে খুব একটা ক্ষমার চোখে দেখেননি সেদিন, সেটা হয়তো এক হিসেবে এদের জয়ই বুঝিয়ে দেয়, কেননা ক্ষমাহীন প্রত্যাঘাতের আয়োজন থেকেই ধরা যায় যে, আঘাতটা কোনোখানে পৌঁছচ্ছিল ঠিক। এঁরা যদি এঁদের চারপাশের মুখোশগুলিকে আঘাত করতেই চান, তাহলে প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি থাকাই তাঁদের ভবিতব্য। তাই সমাজের চোখে নিন্দনীয় হয়ে ওঠা বা খানিকটা জেলপুলিশ করে আসাটা বাইরের দিক থেকে অপমানজনক এবং দুঃসহ হলেও এর মধ্যে একটা জয় ছিল কোথাও।"[৩] আসলে বিশৃঙ্খল এই পৃথিবীর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীল রসিকতা করার সাহস তাঁরা দেখিয়েছেন। তাঁরা সেই 'চরমপন্থী শিল্পী', যারা নিজেদের শিল্পকর্মের প্রতি চূড়ান্তভাবে সমর্পিত, যারা 'কবিতাকে জীবনের একটি মূল শক্তি' বলে মনে করতেন ('ক্ষুধার্ত'-এর ষষ্ঠ সংকলনে প্রকাশিত শৈলেশ্বর ঘোষের 'ফালগুনী রায়'

শীর্ষক লেখা)। সমসাময়িক বাস্তবতাকে তাঁরা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন; নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন স্থবির চিন্তার জড় পিণ্ডকে – এখানেই তাঁদের প্রতিভা। হেনরি মিলার একদা বলেছিলেন, "প্রতিভা চিরাচরিতকে ভেঙে চুরে দেয়, সবকিছুরই পুরোনো ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।"[৪] কবি শঙ্খ ঘোষও বলেছেন, "যা সচল এবং বহুল, তার প্রশ্রয় পেলে সমকালীন সফলতার সম্ভাবনা বাড়ে, এইটেই হয়তো দুর্বল মনের পক্ষে মস্ত এক আকর্ষণ। যে-কোনো শিল্পের মধ্যেই আছে এক অমান্যতা, অবাধ্যতা। প্রতিষ্ঠান চায় মান্যতা আর বাধ্যতা। তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে ভিতরে-ভিতরে এক লড়াই।"[৫]

তথাকথিত অর্থে 'কবিতা' তাঁরা লেখেনি – তাঁদের কবিতা তাঁদের চিন্তা, কল্পনা প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। তাঁদের জীবন-পদ্ধতি ও রচনা দুই-ই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। তাঁদের উপস্থিতিই তাদের কাছে ভয়ের ও বিরক্তির। তাই উঠে পড়ে লাগা হয়েছিল হাংরিদের পেছনে। উইলিয়াম বারোজ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "কত রকমের মাদক রয়েছে। ধর্ম মাদক, অতিন্দ্রিয়তা মাদক, ক্ষমতা মাদক। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যা করা যায় তা অন্যভাবেও করা যায়। বহু পুলিশ ক্ষমতা মাদকাসক্ত। এরা দুর্বল অসহায় মানুষের উপর ঘৃণ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাজনীতিকরাও এর বাইরে নয়। এই ঘৃণ্য ক্ষমতাসক্তিকে আমি বলি শ্বেত মাদক। এই সমস্ত লোকেরা সব সময় সঠিক, সঠিকতা এদের দাবি। ক্ষমতা একবার হারালে এরা মারাত্মক মাদকশূন্যতার যন্ত্রণায় ভোগে। রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা ভোগ করে, ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ যাদের আছে – তারা ক্ষমতা হারাবার কথা ভাবতেই পারে না – ক্ষমতানেশা এদের জীবনমরণ।"[৬] সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান চায় তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। আর তাই প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাংরিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। শৈলেশ্বর ঘোষ 'যে কেউ আমার/আমাদের লেখা পড়বে'[৭] শীর্ষক লেখায় তুলে ধরেছেন সেই অভিযোগগুলির একটি তালিকা –

১। এইসব অপগণ্ডের দল নোংরামি করাকেই সাহিত্য বলে মনে করে

২। অশিক্ষিত

৩। বাংলা সাহিত্যে এদের দান এক বালুকণারও বেশি নয়

৪। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক যাদের পুলিশ ভুলভাবে বিদ্রোহী ভাবে

৫। ওঃ এ তো আমেরিকায় ছাপা পত্রিকাগুলির কপি করা মাল

৬। এই উঠতি গুণ্ডাদের এখনই দমন করা উচিৎ

৭। উল্লুকরা শুধু মাস্টারবেট করে

৮। যৌনাঙ্গ পূজক

৯। এদের লেখাকে সাহিত্য বলে মনে করা আর পানের দোকানে লুকিয়ে যা বিক্রি হয় তাকে সাহিত্য মনে করা এক

১০। শূয়ারেরবাচ্চাদের কি মা মাসি নাই

১১। জুতার তলে পিষে দাও কৃমিকীটদের

১২। এদের লেখা ভদ্রলোক পড়তে পারে না

১৩। পুলিশ, পুলিশ কি মরে গেছে

১৪। বাংলা দেশের তরলমতি ছেলেমেয়েদের এরা বিপথে নিয়ে যাচ্ছে – ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ'রকমই ছিল বিচারের ভাষা। একথা ঠিক যে মুখোশে টান দিলে মুখোশধারী ফুঁসে উঠবেই। জীবনের সত্য বিন্দুর দিকে যেতে থাকলে যে সচেতনতায় আঘাত পড়ে তা সকলে সহ্য করতে পারে না, ভালো লাগে না। শৈলেশ্বর ঘোষ বলছেন, "যে পৃথিবীতে সুখ অতি সহজ, একটি মুখোশের দাম যেখানে একটি কানা কড়ির বেশি নয়, ন্যায়পরায়ণ ভণ্ডামি যেখানে সত্য হিসাবে মূল্য পায়, সেখানে যে অস্তিত্ব মূলত একা আলাদা, স্বাধীন হয়ে যাওয়া যার আকাঙ্ক্ষা, নিজের জীবনই যার মুক্তির শখ, শরীরই যার কেবল মাত্র কম্যুনিকেট করে তাকে পৃথিবী বরদাস্ত করতে রাজি নয়, রাজি নয় সমাজ রাষ্ট্র – তাই প্রতিটি মানুষ যখন একা আলাদা হয়ে যাতে থাকে তখনই পৃথিবীর সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হয় – তাকে ইতিহাস অপরাধী বলে ঘোষণা করে – ঘোরতর এই যুদ্ধের পারমানবিক বিস্ফোরণই সাহিত্য এবং এখানে জীবন ও সাহিত্য এক – কোনো তফাৎ থাকা মানেই কৃত্রিমতা মেনে নেওয়া – মানুষের ইতিহাসে অতঃপর এই যুদ্ধের ধারাবিবরণীই থেকে যাবে আর থাকবে প্রতিটি একক যোদ্ধার পরাজয় ও পতনের কাহিনি – 'কল্যাণধর্ম' 'মূল্যবোধ' শব্দগুলি কেবল বিচারকই উচ্চারণ করে যাবে।"[৮] প্রতিষ্ঠান তাই ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছে হাংরিদেরকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু আমরা জানি যে, "উন্মাদ তাকেই বলা হয় সমাজ যার কথা শুনতে চায় না এবং অসহনীয় সত্যগুলি সে যাতে বলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে।"[৯] ('সমাজের বলি ভ্যান্ গখ্' - আঁতোয়া আর্তো)। যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিজেই এক সময় হাংরি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনিই পরে হাংরিদেরকে বললেন 'উল্লুকের দল ... নষ্ট প্রতিভা।'[১০]

চৈতন্যের সম্প্রসারণই কবিতার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ, এই লক্ষণের বিচারেই হাংরিরা নিজেদেরকে কবি মনে করতেন। কোনো বিশেষ বাণী দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রদীপ চৌধুরী পঞ্চম সংকলনে 'পুনশ্চ' শীর্ষক লেখায় বলেছেন, "পৃথিবীকে দেবার মতো কোনো বাণী বা 'মেসেজ' কোনো লেখকেরই নেই – যিশু-বুদ্ধ-হজরত, কোনো মহাপুরুষই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা নন। 'ত্রাণ' জিনিষটাই অসম্ভব। ত্রাণ সৃষ্টিবিরোধী। পৃথিবীর কনসেপশনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ – এবং মৃতদেহ ছাড়া এর স্বরূপ কারোর কাছেই পরিষ্কার নয়।"[১১] এতে তাঁদেরকে কেউ কবি মনে না করলেও, তাঁদের কোনো অভিযোগ নেই। 'ক্ষুধার্ত'-এর ষষ্ঠ সংকলনে শৈলেশ্বর ঘোষ 'ফালগুনী রায়' শীর্ষক লেখায় জানিয়েছেন যে, মধ্যবিত্ত ভাঁড়, শব্দের হালুইকর, বাজারের দালালরা তাঁদেরকে কবি মনে করে কিনা এ নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যাথা ছিলই না। সত্যকথনের তাড়নায় হাংরিরা সমস্ত মেকিপনাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, একথা স্বীকার করে 'ক্ষুধার্ত' দ্বিতীয় সংকলনে দেবেশ রায় 'বিলম্বিত সাওয়াল' শীর্ষক লেখায় বলেছেন, "অপরাধবোধ আমার প্রবল হয়ে ওঠে যখন বুঝতে পারি আমাদের দৃষ্টি থেকে সেদিন চিনতে পারিনি। আমরা বুঝতে পারিনি স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশকব্যাপী বঞ্চনা আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে অধৈর্যে অস্থির এই লেখাগুলো আঘাত করতে চাইছে এই পুঁজি-সমাজের গায়ের ভিতে। বুঝতে পারিনি যে-সত্যকথন কথাশিল্পের একমাত্র মাপকাঠি, সেই সত্যকথনের তাড়না এই লেখাগুলির অক্ষরে বিন্যাসে। হয়তো কখনো কখনো অংশ সত্যই সমগ্রের চেহারা ধরে এসেছে, হয়তো সমগ্র সত্য আবিষ্কারের জন্য জরুরি চাবিকাঠিটি এদের হাতে নেই – কিন্তু কে অস্বীকার করবে লেখাগুলোর বিশ্বস্ততা, অস্বস্তিকর বিশ্বস্ততা। আর তাই শব্দের মায়ায় সাজানো গোছানো ডামির এই সমাজে এ-রচনা তাৎপর্যে নিঃসন্দেহেই মানুষের সন্নিহিত।"[১২] হাংরি সাহিত্যকে বুঝতে না পারার অপরাধবোধ স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। অস্বীকার করতে পারেননি লেখাগুলির বিশ্বস্ততা, অস্বস্তিকর বিশ্বস্ততাকে। তাই 'বিলম্বিত সাওয়াল' শীর্ষক লেখাটির শেষে বলেছেন -

> বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা সাহিত্যের বা গল্পের পরপুরুষ নন। পুলিশ, হাকিম, প্রকাশক পত্রিকা, সার্টিফিকেট-সই-করা গেজেটেড সাহিত্যিকরা যতই বিপরীত সাক্ষ্য দিন, বাসুদেব ও সুভাষ এই সময়ের পক্ষে নিতান্ত জরুরি লেখক। আর মাত্র এই কটি লেখাতেই বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা গদ্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন তাদের লেখার জোরে। গল্পের বিষয় হিসেবে

নিজেদের ও শুধুমাত্র যেন নিজেদেরই উপস্থিত করে অনেক কুসংস্কার দূর করেছেন। গল্পকে আত্মবিষয়ী করে তুলতে পেরেছেন। গল্পের উপকরণের ব্যবহারের ওপর তাঁদের কর্তৃত্বের কোনো সংশয়েরও অপেক্ষা নেই। দেবতাদের কয়েক মিনিট, অভিরামের চলাফেরা, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট ও আমার চাবি – সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের বিশিষ্ট সূচিপত্রের অন্তর্গত। তাই আমাদের এ-প্রত্যাশার কারণ থেকেই যাবে – তাঁরা ক্রমাগতই গন্ডি থেকে গন্ডি থেকে গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসবেন। (ক্ষু স, পৃ.১৮১)

গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক বাঁধা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁদের, অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। তবুও নিজের প্রতি, নিজের কবিতার প্রতি, নিজের মতাদর্শের প্রতি সৎ থেকেছেন অনেকেই শেষপর্যন্ত। যে সব 'ছোটো মানুষের দল ছোটো ছোটো টুপি নিয়ে/ ছোটো ছোটো চেয়ারের কথা বলে'[১৩], তাঁদের মতো ছোট নন হাংরিরা। এস্টাব্লিশমেন্টের দেওয়া মিহি ভাত কাপড় নিয়ে লেখকের অপমৃত্যু বরণ করার চেয়ে দুঃখবরণ করাই এই সমাজ ব্যবস্থায় লেখকের প্রকৃত কর্তব্য বলে হাংরিরা মনে করতেন। আমরা দেখেছি, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতায় স্থির অবিচল মলয় রায়চৌধুরী নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন সাহিত্য অকাদেমিসহ বহু পুরস্কার। আবার সুভাষ ঘোষ তাঁর 'আলফা বিটা গামা' শীর্ষক লেখায় বলেছেন –

এই আমি একজন – সুভাষঘোষ – নিজেকে কখনোই লেখক বলে গণ্য করতে পারিনি - ... এই আমি যেমন, তেমনি আমার বন্ধুরা – প্রদীপসুবোবাসুশৈলেশ – এরা কেউই লেখক কবির পরিচয় চায় না – মানে এরা "উদীয়মান/শক্তিমান কবি/কথাশিল্পী" এইসবকে ইয়ে করে – পরে অবশ্য কী হবে জানি না – যদি ইতিমধ্যে এদের কারো কোনো একটা পা খোঁড়া না হয় (ক্ষু স, পৃ.৯৬)

হাংরি আন্দোলন কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবনার ছকে আবদ্ধ নয়, হাংরিদের কাছে এই আন্দোলন 'ক্রম পরিবর্তনশীল এক ধারণা – এ ওয়ে অব্ লাইফ'; 'ক্ষুধার্ত' তৃতীয় সংকলনের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে –

জীবনের বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে আক্রমণ করাই হাংরি পদ্ধতি – আমরা মনে করি এক্ষেত্রে আমরা একা নই, আমাদের পাশে রয়েছেন সচেতন বিদ্রোহী পাঠক মণ্ডলী, যারা একইভাবে জীবন বিরোধী প্রতিষ্ঠানশক্তির আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন। আমরা আগেও বলেছি আমাদের কোনো প্রতিভা নেই – প্রতিভাবানদের দেখতেই পাচ্ছেন, পুরস্কারের মালা গলায় নিয়ে যারা ক্রমাগত উপরের তলায় চড়ে যাচ্ছেন। আজকের যারা তরুণ লেখক, সচেতন নবাগত, তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, ফুরিয়ে যাওয়া ধূর্তদের উদ্দেশ্য প্রসূত কুৎসায় কান না দিয়ে, আসুন, আত্মপ্রকাশের ন্যূনতম স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এক সঙ্গে কাজ করি। (ক্ষু স, পৃ.২৭২)

এঁদের কবিতা পড়লে মনে হয় প্রত্যেকের জীবন যেন কবিতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে পড়েছে। কবিতা এঁরা বানাননি। এঁদের লেখার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক একজনের গোপন জীবন, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, ক্রোধ-লালসা এবং তা'ই হয়েছে এঁদের কবিতা। সত্য গুহ হাংরি কবিতাকে হাংরিদের 'উলঙ্গ জীবনেরই দিব্য প্রতিকৃতি'[১৪] হিসেবে বুঝেছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন' শীর্ষক লেখায় বলেছেন –

> মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা এবং মৈথুনের পার্থিব অনুপান ঘেঁটেঘুঁটে, তার কাদায়, রক্তে, রসে মাখামাখি হয়ে জীবনটাকে চেখেচুখে 'ধর্ম' শব্দটি ওরা উচ্চারণ করতে চাইলেন। এখানে অভিজ্ঞতাই ধর্ম, এদের মন্ত্র তাই অনেক ক্ষেত্রেই 'কোড', প্রথাসিদ্ধ শব্দের 'স্ট্যাবলিসমেন্ট ভেঙে এরা 'প্রহেলিকার' আশ্রয় পর্যন্ত নিয়েছে মন্ত্রে – কারণ সাহিত্য রচনা এদের উদ্দেশ্য নয়, সর্বজনবোধ্য ধর্মের তাত্ত্বিক প্রচার পুস্তিকা রচনাও এদের অভিপ্রেত নয়। জীবনকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে, চেখে; ছেঁকে বের করে তার 'ডকুমেন্ট' রাখা মাত্র। নিছক দীক্ষিত যিনি তার কাছেই এর গুরুত্ব, অন্যজন সংসারে সুখে থাকুক। (ক্ষু স, পৃ.৮১)

কেবল প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতাতেই হাংরিদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকেনি, জীবনকে তাঁরা খোলা চোখে গোটাভাবে দেখতে চেয়েছেন। হাংরিদের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য ভাষা-ব্যবহারে, শব্দ-প্রয়োগে মেকি 'নাটক-নভেলের ভাষা'র থেকে প্রাত্যহিক জীবনের মৌখিক ভাষার দিকে দু'এক কদম এগিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সেই প্রয়াস আগেই শুরু হয়েছিল। অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয় লাথি মারবো পোঁদে" (শক্তি চট্টোপাধ্যায়/সম্প্রতি/১ম বর্ষ/ প্রথম সংখ্যা/ ১৯৬১) উক্ত 'ভালোবাসা' নামের কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আমি সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশ করি। এটিই ষাটের দশকে প্রকাশিত প্রথম অশুদ্ধ বা অশ্লীল কবিতা। যদিও ঐ "পোঁদে" শব্দটি ছাড়া কবিতাটি একটি সুন্দর লিরিক। এ কবিতার পর যোনি, লিঙ্গ, সঙ্গম ইত্যাদি শব্দ সহযোগে ও নানা যৌনধর্মী চিত্রকল্পের প্রয়োগে অজস্র গদ্যপদ্য রচনা তৎকালীন সম্প্রতি, কৃত্তিবাস বা ঈষৎ পরে প্রকাশিত ক্ষুধার্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[১৫]

আবার মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন' শীর্ষক লেখায় বলেছেন –

> সভ্যতার মূঢ়তায় নির্মিত যাবতীয় Power-symbol-identity–র মেকি মুখোশ এবং Stablishment–এর কাগজের তৈরি দুর্গগুলো প্রবল ফুৎকারে তছনছ করে ব্যক্তিত্বের অমোঘ এবং একাগ্র দুঃসাহসিক নৈঃসঙ্গকে উন্মোচিত করেছেন। যাবতীয় মিথ্যের আবরণ ভঙ্গ করে সততার এই যে উলঙ্গ উল্লম্ফন, অভিজ্ঞতাকে শব্দে ও রচনায় এই যে নিনাদিত

করে তোলার প্রলয়-প্রেরণা তার প্রকাশ পূর্ববর্তী ও সমকালীন কোনো কোনো লেখকের মধ্যে শ্রুত হলেও এত নিখাদে এবং জীবনব্যাপী এতখানি প্রয়োগগত নিষ্ঠায় লক্ষ করা যায়নি। (ক্ষু স, পৃ.৮২)

আবার সুভাষ কুণ্ডু 'হাংরি রচনা ধর্ম না অশ্লীলতা?' শীর্ষক লেখায় বলেছেন, "এই উত্থান আকস্মিক নয়; অত্যন্ত সঙ্গত, স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এই হাংরি আন্দোলন বুর্জোয়া সভ্যতা ধর্ষিত ১৮ ইঞ্চি পলেস্তারা পড়া, ঝাঁঝরা নির্বিজ ভারতবর্ষের মাটিতে আত্ম-প্রকাশ করে, কিন্তু হিব্রুদের হাতে নির্যাতিত যিশুর মতোই এসব হাংরিরা কামার্ত স্ত্রী পুরুষ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, নপুংসক রাজনীতি ও বুর্জোয়া এসটাব্লিশমেন্টের ঈর্ষা, ঘৃণা, ধিক্কারের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।"[১৬] আমরা দেখেছি, যারা হাংরি লেখাকে অশ্লীল বলে দেগে দেন, তাঁরাই আবার 'বিবর' বা 'প্রজাপতি' পড়েন গদগদ হয়ে। ১৮৬৫ তে দুর্গেশনন্দিনীর ঠিক এক শতাব্দী পরে ১৯৬৫ তে সমরেশ বসুর 'বিবর'কে বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি মাইলস্টোনের মর্যাদা না দিলে দিনক্ষণ মেপে খাপে খাপে মিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতার কী হবে! না, 'বিবর'-এর সাহিত্যমূল্য বিচার এখানে বিচার্য নয়। শুধু এটুকুই বলার, সাধারণ পাঠক যদি 'বিবর' পড়তে পারে, তাহলে হাংরি লেখা কেন পড়তে পারে না? এসবই আসলে সেই বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্টের খেলা; যার সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষ মনে করেন "সাহিত্যের, সমাজের, আমাদের মূল্যবোধের, আমাদের জীবনযাপনের সামুহিক ক্ষতি করাই এস্টাবলিশমেন্টের কাজ।"[১৭] এই এস্টাব্লিশমেন্টের ছত্রছায়ার থাকা 'প্রাতিষ্ঠানিক কবি ও লেখকদের' নিয়ে নির্মল হালদার লিখেছেন এমন লাইন – "কী যে লিখি কী যে লেখা যায়/ আমাদের স্বার্থরক্ষাকারী কাগজেই/ আমাদের মৃত্যু, মৃত্যুর স্তব্ধতা!"[১৮] সেই বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট সমরেশ বসুর লেখাগুলিকে দিব্বি গিলিয়ে নিয়েছে পাঠককে। হাংরিদের বিরুদ্ধে যেমন বিক্ষোভ, সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। হাংরি লেখাকে যৌনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁরা সমরেশ বসুর 'বিবর' গোগ্রাসে গেলে। আসলে সমস্যা যৌনতা নিয়ে নয়, বা অশ্লীলতা নিয়ে নয়। সমস্যা ছিল অনেক গভীরে, একদম মূলে। বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্টের ভণ্ডামি, মেকিপনা সব ধরা পড়ে গিয়েছিল হাংরিদের চোখে। একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়, 'বিবর' লেখার পেছনেও কি হাংরি প্রভাব ছিল না কিছুই? হাংরিদের নিয়ে পাঠক-মহলে যে বিপুল হইচই, বা 'দুর্নাম' হলেও সেটাও তো একপ্রকারের 'নাম' করা, সেখান থেকে নিজেদের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বা সোজা কথায় 'বাজার টানা'র জন্যই কি সমরেশ বসুকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়নি 'বিবর' বা 'প্রজাপতি'র মতো উপন্যাস? 'প্রজাপতি'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সমরেশ বসুর বয়ান

থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁকে এই উপন্যাসটি লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকা। তৎকালীন সম্পাদক অশোককুমার সরকারের স্বীকারোক্তিমূলক সেই বয়ানটিকেই তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু –

> ১। লেখককে আমরা লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তিনি লিখেছেন। ২। আমরা সেই লেখা ছেপেছি। ৩। এখন সেই লেখা যখন অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে, তখন তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব আমাদেরই।[১৯]

হাংরি জেনারেশনের জন্মের মধ্যেই আন্ডারগ্রাউন্ড চরিত্রের বীজ নিহিত ছিল তাই অতি দ্রুত প্রাচীনপন্থীরা সমবেত হয়ে (ভারতীয় লেখক সম্মেলন, সিমলা) ঘোষণা করেন ভারতবর্ষে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য নেই।[২০] তাঁরা ভয় পান আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যকে – এই আন্দোলন যে তাঁদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেবে তা তাঁরা জানতেন। গেরিলা বিপ্লবীদের যেমন প্রতিষ্ঠিত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চক্র ভয় পায়, আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যকেও ভয় পায় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান। ষষ্ঠ সংকলনে শৈলেশ্বর ঘোষ বলছেন –

> রাজনৈতিক ধান্দাবাজ, যৌনশোষণকারী, সাংস্কৃতিক ফড়ে – সকলের উপরই আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য তীব্র আঘাত করে – এদের প্রতিষ্ঠানের কাছে ও কায়েমী স্বার্থের কাছে যেসব চিন্তা বিপজ্জনক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মনে হয়, দেখা যায় আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য সেগুলিই লালন করে। এই সাহিত্যের শরীরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এতাবৎকালের সৃষ্ট সাহিত্যের চেহারার সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না। একজন বাবুর পাশে একজন উপজাতিকে দাঁড় করালে যে পার্থক্য ধরা পড়ে – এও সেই ধরনের পার্থক্য। ভাষার শুচিবাই এই সাহিত্য ত্যাগ করে বলেই এই সাহিত্য প্রাতিষ্ঠানিক ভদ্রলোকদের বমির উদ্রেক করে। ... হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সবগুলি শর্তকেই পূরণ করে বলেই এই আন্দোলন ভারতীয় সাহিত্যের এখনও অবধি প্রথম এবং একমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলন। (ক্ষু স, পৃ.৪৭৫)

আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা সবদিক দিয়েই হবে পজিটিভ। 'কেবল যারা ন্যাকা আর ধূর্ত তারাই এর মধ্যে নিগেটিভ টেন্ডেনসি খুঁজে পায় – হয় তারা সাহিত্যের কিছুই বোঝে না, না হয় তারাই প্রতিষ্ঠানের মুখোশপরা মুখ।'[২১]

বাংলা সাহিত্য এই আন্দোলন থেকে পেয়েছে কয়েকজন অতি শক্তিশালী কবি ও গদ্যকারকে। এই গদ্যকাররা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। এতদিন পর্যন্ত প্রতীকি জগৎ এবং বাস্তব জগৎ ছিল আলাদা, এবারে বাস্তব এবং প্রতীকি জগৎ আর স্বতন্ত্র থাকল না। বাস্তব, স্বপ্ন, অবচেতন প্রতীক সব একাকার হয়ে 'এক' এ পরিণত হল।

বাস্তব সত্যরূপ পেয়ে পরিণত হল অতি বাস্তবে। এতদিন পর্যন্ত গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে আসার যে চেষ্টা হয়ে আসছিল তাকে সার্থক করে তুললেন এই তরুণ গদ্যকাররা। শুধু ভাষা, আঙ্গিক বা শব্দ দিয়েই নয়, খাঁটি কবিতার বিষয়কেই তুলে নিয়ে এলেন এঁরা গদ্যে। হাংরিরা যেভাবে 'ছোটগল্প' বা 'কবিতা' বা 'উপন্যাস' – এইরকম সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোনো ফর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, সেইরকমই আমরা দেখি সাহিত্যের শ্রেণিবিভাজনে অবিশ্বাসী সুবিমল মিশ্রের গল্প হয়ে উঠেছে 'অ্যান্টি-গল্প', তাঁর উপন্যাস 'অ্যান্টি-উপন্যাস'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বপনরঞ্জন হালদার তাঁর 'প্রকাশ্য দিবালোকে পাকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফটাফট কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছিল যে যুবতী পাগলিটা' শীর্ষক অভিনব গ্রন্থটির উৎসর্গ-পত্রে সুবিমল মিশ্রকে 'বাংলা সাহিত্যের বুনো বাঘ' অভিধায় ভূষিত করেছেন এবং এই উৎসর্গ-পত্রেই তিনি আরও বলেছেন, "একটা মানুষ, যে নিয়ত চিন্তা করে চলেছে, তার লেখাগুলি তার নিজেকে দেখার, নিজের চারপাশ দেখার একটা THOUGHT PROCESS মাত্র।"[২২]

আমরা নবারুণের লেখাতেও দেখি এই 'Thought Process'। সাহিত্য নিছকই সাহিত্য হয়ে থাকছে না আর; সাহিত্য হয়ে উঠছে একধরণের 'দেখা' বা দর্শন। সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস আরও অনেকগুলি বিষয় মিলেমিশে 'সাহিত্য' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হচ্ছে। আমরা তাই দেখি নবারুণের লেখা তৎকালীন সমাজ-রাজনীতিকে বাদ দিয়ে পড়া যায় না। হাংরি লেখাগুলিই প্রথম সেই ধরণের লেখা, যেখানে 'সাহিত্য' হয়ে ওঠা একটি 'Interdisciplinary process' হয়ে উঠছে। নবারুণ তাঁর তৃতীয় গল্প-সংকলন 'অন্ধ বেড়াল'-এর মুখবন্ধে বলেছিলেন, "আমি লেখার ব্যাপারটা যেভাবে বুঝি সেটা নিছক আনন্দ দেওয়া বা নেওয়া নয়। আরও গভীর এক অ্যালকেমি যেখানে বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়েছে।"[২৩]

আরও একজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি সুবিমল বসাক; যিনি 'হাংরি আন্দোলনের লেঠেল'[২৪] বলে বন্ধু-মহলে খ্যাত ছিলেন বলে জানিয়েছেন দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সুবিমল বসাকের গপ্পো : শারীরিক ভাষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে। নিছক প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার জন্য যে হাংরিরা ভাঙনের পথে আসেননি, সেই সম্পর্কে তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই বলেছেন, "প্রতিষ্ঠান যদি শরীরে সেঁধোয়, শরীরকে দোমড়ায়, মোচড়ায়, আমার বুলিকে যদি ব্যাকরণ-সংহিতায় বেঁধে ফেলতে চায়, তাহলে আমার শরীর কি চাইবে না নিজের ভেতরেই ভেন্ন পৃথিবী নির্মাণ করে দাপুটে প্রতিষ্ঠানকে নিগেট করতে?"[২৫]

সুবিমল বসাকের ঢাকাই কুট্টি ভাষা ব্যবহারকে তিনি বুঝেছেন 'ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'[২৬] হিসেবে।

এই আন্দোলনের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি তালিকা[২৭] তুলে ধরে আলোচনা শেষ করা যাক -

১। স্বকাল (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)

২। ফুঃ (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৩। ক্ষুধার্ত খবর (সুভাষ ঘোষ, চন্দননগর)

৪। ক্ষুধার্ত-স্বকাল (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৫। ক্ষুধার্ত সময় (সাত্ত্বিক নন্দী, কলকাতা)

৬। জিরাফ (অরুণেশ ঘোষ, কোচবিহার)

৭। কারুবাসনা (সব্যসাচী সেন, কলকাতা)

৮। নিষাদ (সুবীর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

৯। বিকল্প সাহিত্য (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)

১০। কুরুক্ষেত্র (সমীরণ ঘোষ, শিলিগুড়ি)

১১। উত্তরকাল – এই বিষ অর্জুন – (শুভঙ্কর দাস, কলকাতা)

১২। উদ্বাস্তু (অশেষ রায়, কলকাতা)

১৩। বর্ণ পরিচয় (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

১৪। মানুষের বাচ্চা (সুব্রত সেন, কলকাতা)

১৫। দন্দশূক (সূর্য মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর)

১৬। ফুঃ দ্বিভাষিক (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)

১৭। অজ্ঞাতবাস (অরুণ বসু, নবদ্বীপ)

১৮। উলুখড় (প্রিতম মুখোপাধ্যায়, হাওড়া)

১৯। সমবেত আর্তনাদ (শুভঙ্কর দাশ, কলকাতা)

২০। আর্তনাদ (দেবী রায়চৌধুরী, ত্রিপুরা)

২১। দশদিগন্ত (আশিষ ভট্টাচার্য, কোচবিহার)

২২। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প (রাজা সরকার, শিলিগুড়ি)

২৩। মমার্ত (সাত্বিক নন্দী, ত্রিপুরা)

২৪। মত্ত নীল ডানা (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)

২৫। জঠর (শঙ্খপল্লব আদিত্য, ত্রিপুরা)

২৬। আস্পর্দ্ধা (সোমা ভট্টাচার্য, কলকাতা)

২৭। জখম (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)

২৮। কালামাটি (অজিত রায়, আসানসোল)

২৯। পাগলা ঘোড়া (বিজয় দে, জলপাইগুড়ি)

৩০। খনন (সুকুমার চৌধুরী, নাগপুর)

৩১। অনার্য (সেলিম মুস্তাফা, ত্রিপুরা)

৩২। টার্মিনাস (অনুভব সরকার, মাথাভাঙা)

৩৩। সময়সূত্র (মলয় ঘোষ, জলপাইগুড়ি)

৩৪। পাঁক ঘেটে পাতালে (তড়িৎ চৌধুরী, গৌহাটী)

৩৫। নিম সাহিত্য (মৃণাল বণিক, দুর্গাপুর)

৩৬। রোবট (জীবতোষ দাস, কোচবিহার)

৩৭। শব্দভেদী (অশোক অধিকারী, কলকাতা)

৩৮। গেরিলা (অরুণ বণিক, ত্রিপুরা)

৩৯। সৃজন (সুমিতেশ ঘোষ, কোচবিহার)

৪০। কবিতা ক্রিয়া ইন্ডিয়ানা (উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা)

৪১। BAD (তপন পালিত, কলকাতা)

৪২। ক্রমশ (অলোক গোস্বামী, শিলিগুড়ি)

৪৩। কবিতাপত্র সংবর্ত (সমর ঘোষ, অশোকনগর)

৪৪। এখন এ-রকম (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)

৪৫। তৌর্যতিক (মলয় মজুমদার, শিলিগুড়ি)

৪৬। সাপ্তাহিক গ্রাফিত্তি (শর্মী পাণ্ডে, কলকাতা)

৪৭। একলব্য (দেবব্রত ভট্টাচার্য, কোচবিহার)

৪৮। বাইসন (শ্যামল রায়চৌধুরী ও প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা)

৪৯। ঢিল (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)

৫০। ঋদ্ধ (সুব্রত পাল, নবদ্বীপ)

৫১। ব্যাস (স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য ও অনমিত্র রায়, কলকাতা)

৫২। তিতির (সঞ্জয় সাহা, মাথাভাঙা)

৫৩। চিদাত্মা (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)

৫৪। প্রস্তুতিপর্ব (শুভেন্দু সমাদ্দার, বালুরঘাট)

৫৫। দ্রোহ (দিবাকর ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি)

৫৬। প্রতিসর্গ (অশোক অধিকারী, কলকাতা)

৫৭। নান্দিমুখ (স্বপন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা)

এছাড়াও সাম্প্রতিক বেশ কিছু পত্রিকাকে এই ঘরানার বলেই মনে হয়, যেমন বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত 'মধ্যবর্তী' পত্রিকার কথা বলা যেতে পারে। এই পত্রিকায় পাতায় প্রায়ই মলয় রায়চৌধুরীর সাম্প্রতিক লেখাপত্রগুলি ছাপা হয়ে থাকে। ২০১৯ সালের উৎসব সংখ্যায় এই পত্রিকা নিজের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিল এভাবে–

১। বাজারী লেখক কবিদের আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি।

২। বনসাঁই কবিদের দেখে মুচকি হাসছে সময়।

৩। আজ এরা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু।

৪। আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা ফরমায়েশী কবিরা ধার করা দার্শনিকতা দিয়ে নিজেদের ভোলাবেন আর কতদিন। বেশ সুখী সুখী বেলুন বেলুন লাগছে তাইনা!

৫। শিল্পী বা কবি হওয়া আর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক জিনিস নয়।

৬। এস্টাবলিশমেন্টের পিঠ চাপড়ে দেওয়া লেখালেখিকে আমরা ঘৃণা করি।

৭। আমরা চাই লোকে আমাদের আঙুল তুলে খারাপ বলুক।

৮। প্রশংসা পুরস্কার নিয়ে অল্প দিনে ঝরে যাবেন না।

৯। সবসময় পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে থাকুন।

১০। চিন্তার মধ্যবিত্ততাকে ছুঁড়ে ফেলুন।

১১। আপনার পাঠক হোক নির্বাচিত। খারাপ তথাকথিত এলিট গৃহপালিত মিষ্টি ঢ্যামনা পাঠক নয়।

১২। ভাষার ভেতর তুমুল অন্তর্ঘাত চালান।[২৮] ইত্যাদি।

এছাড়া ২০১৭ সালের উৎসব সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'[২৯] পাতাটির একটি প্রতিলিপিও এখানে তুলে ধরা যাক –

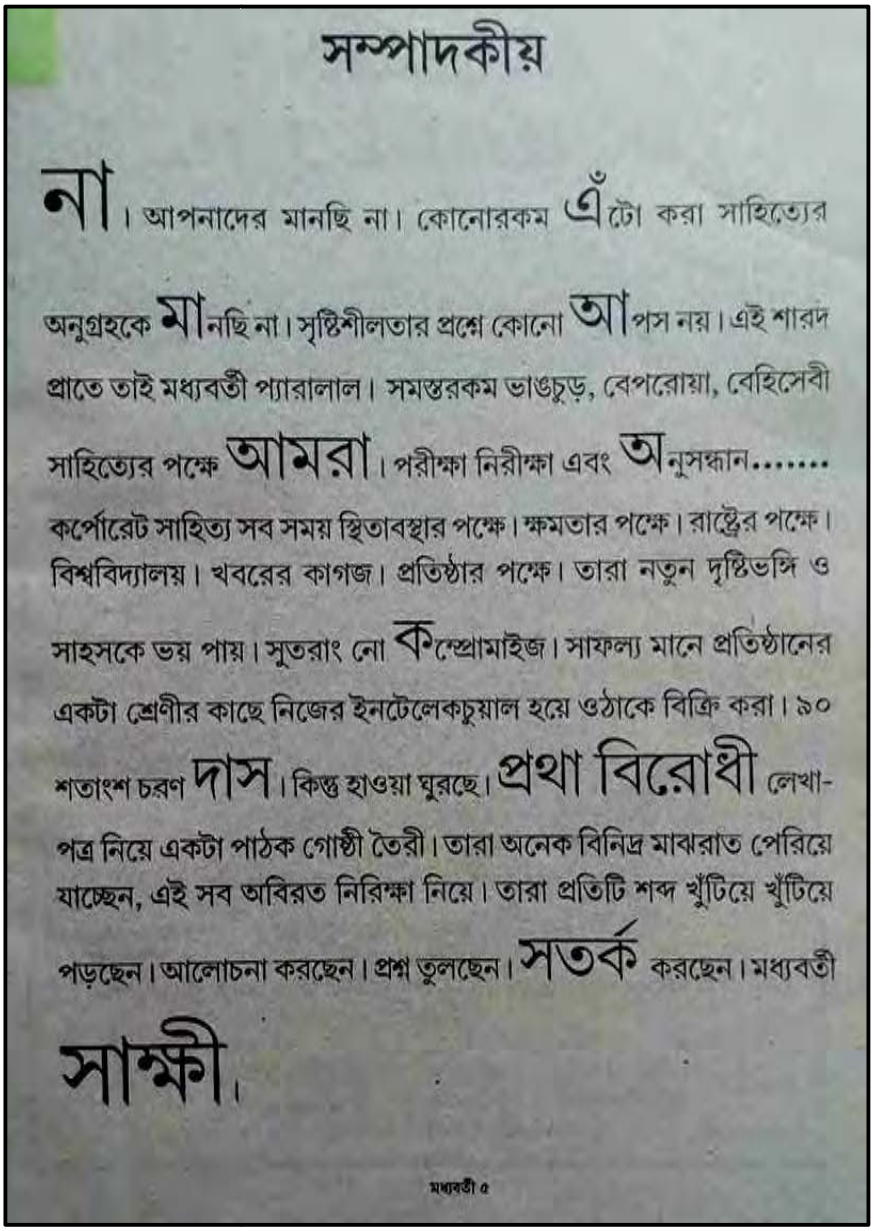

সম্পাদকীয়

না। আপনাদের মানছি না। কোনোরকম এঁটো করা সাহিত্যের অনুগ্রহকে মানছি না। সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নে কোনো আপস নয়। এই শারদ প্রাতে তাই মধ্যবর্তী প্যারালাল। সমস্তরকম ভাঙচুড়, বেপরোয়া, বেহিসেবী সাহিত্যের পক্ষে আমরা। পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান..... কর্পোরেট সাহিত্য সব সময় স্থিতাবস্থার পক্ষে। ক্ষমতার পক্ষে। রাষ্ট্রের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়। খবরের কাগজ। প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসকে ভয় পায়। সুতরাং নো কম্প্রোমাইজ। সাফল্য মানে প্রতিষ্ঠানের একটা শ্রেণীর কাছে নিজের ইনটেলেকচুয়াল হয়ে ওঠাকে বিক্রি করা। ৯০ শতাংশ চরণ দাস। কিন্তু হাওয়া ঘুরছে। প্রথা বিরোধী লেখা-পত্র নিয়ে একটা পাঠক গোষ্ঠী তৈরী। তারা অনেক বিনিদ্র মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছেন, এই সব অবিরত নিরিক্ষা নিয়ে। তারা প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন। আলোচনা করছেন। প্রশ্ন তুলছেন। সতর্ক করছেন। মধ্যবর্তী সাক্ষী।

মধ্যবর্তী ৫

এই বক্তব্যে, এই বাচনভঙ্গিতে হাংরিসহ ষাট-সত্তর দশকের সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের উত্তরাধিকার বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না একটুও।

২। শ্রুতি

পাঠক জানেন 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাশ, পরেশ মন্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শ্রুতির প্রথম চারটি সংখ্যার পরে অনন্ত দাশের আর কোনো লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তাই পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায় – এই চার জন কবিকেই শ্রুতি আন্দোলনের প্রধান কবি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে পত্রিকার সাংগঠনিক কাজের পুরোধা ছিলেন মৃণাল বসুচৌধুরী এবং তাত্ত্বিক নেতৃত্ব ছিল পুষ্কর দাশগুপ্তের। শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন –

> শ্রুতি আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ঘোষণা স্লোগান ইত্যাদি যৌথভাবে প্রকাশিত হলেও এগুলি বেশীর ভাগই পুষ্কর দাশগুপ্তের রচনা ও পরিকল্পনা ছিল। ... কবিতায় ভাষার ব্যবহারে, স্তবক বিন্যাসে, শ্রুতিদর্শন ও অনুশাসনে প্রাণিত সার্থক কবি হয়েও শ্রুতিসঙ্ঘের সর্বাধিক সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী মৃণাল। প্রকৃতপক্ষে প্রধানত ওরই উদ্যোগে 'শ্রুতি'র প্রকাশ দশম সংখ্যা (মার্চ ১৯৬৯) পর্যন্ত মসৃণভাবে ঘটেছে। তারপরও, যখন শ্রুতিপরিষদ অবসন্ন, প্রায় মুমূর্ষ, মৃণাল একক উদ্যোগে তারপরও, একাদশ থেকে চতুর্দশ চারটি সংখ্যা প্রকাশ করে শ্রুতির পুনর্জীবনের জন্য শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করে।[৩০]

শ্রুতি কবিগোষ্ঠী যে ক্রমে ভেঙে গেল এবং শ্রুতি কবিতাপত্রের প্রকাশ বন্ধ হল, তার কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। যদিও 'রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে রমানাথ রায় বলেছেন, "সব আন্দোলন যেমন একসময় বন্ধ হয়ে যায় – এদেরটাও শেষ হয়ে গেল। কারণটা এই – পুষ্কর চলে গেল বিদেশে, এটা একটা বড় কারণ, তাছাড়া আন্দোলনের হাল ধরার মত কেউ ছিল না।"[৩১] তবুও কিছু প্রশ্ন ওঠে; শ্রুতির কবিগোষ্ঠীর কবিতা-সম্পর্কিত আদর্শ ও চিন্তায় ঐ গোষ্ঠীর সকলেরই কি আদ্যন্ত আন্তরিক প্রত্যয় ছিল? নাকি কারো কারো মনে ঐ আদর্শ ও চিন্তায় একাগ্র, অবিচল থাকার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কালক্রমে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা ও সংশয়? শ্রুতিতে তার নিজস্ব কবিগোষ্ঠীর বাইরে থেকে এত কম কবির কবিতা নেওয়া হত যে তার প্রতিক্রিয়ায় ঐ গোষ্ঠীর কবিদের কবিতা বাইরের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একথা জানিয়েছেন অরুণকুমার ঘোষ 'শ্রুতি : একটি কবিতাপত্র : একটি আন্দোলনের প্রয়াস'[৩২] শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর লেখা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, ঐ সময়ে তরুণ বাঙালি সাহিত্যপ্রয়াসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য এক ক্লিন্ন লোলুপতা প্রায় ব্যাধির মতো দেখা

দিচ্ছিল। আর প্রবীণ, অর্ধপ্রবীণ, নবীন সকলের মধ্যেই চিন্তাবিরহিত অনর্গল লেখনীচালনার একটা প্রবল ঝোঁক তো ছিলই। তন্নিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও সততার প্রচন্ড অভাবে, তদ্গত অনুধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা – এসবের কোনো প্রয়াস ছিল না। শুধু ছিল রচনাপ্রকাশের পাটোয়ারী তৎপরতায়, যান্ত্রিক অভ্যাসে, লেখার পিঠে লিখে যাওয়া! তাই তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগে, "এই লোলুপতা, এই তৎপরতা, শ্রুতির কবিগোষ্ঠীর কাউকেই কি তখন চঞ্চল করেনি?"[৩৩] অরুণকুমার ঘোষের এই প্রশ্ন একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এই আন্দোলন শুরু করার পেছনেও কারোর কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য খানিকটা হলেও ছিল। কী ছিল সেই উদ্দেশ্য? এপ্রসঙ্গে অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা হল –

> এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল, পঞ্চাশের একাংশের সঙ্গে ষাটের একাংশের বিরোধ। ব্যাপারটা হচ্ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ষাটের রমা ও পবিত্রর কাজিয়া। ঘটনাক্রমে শক্তি একবার রমাকে বলেছিলেন, তোর ছাল ছাড়িয়ে নোব। আর একবার পবিত্রকে বলেছিলেন, তোর ধুতি সাদা, সাদা জুতোও পরেছিস, মাথায় একটু ঘোল ঢেলে এলে আরো বড় কবি হতে পারবি। – এসব খুবই অশালীন ও আপত্তিকর কথাবার্তা। কিন্তু সে সময় শক্তি প্রায়শই এ ধরণের অমার্জিত ব্যবহার অনেকের সঙ্গেই করতেন, এবং যথেষ্ট নিন্দিতও হয়েছেন। সন্দীপনও একবার রমার কোন গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে খুবই অসাহিত্যিক ও অভদ্র উক্তি করেছিলেন। এ ধরণের অমার্জিত ব্যবহার ও অপমানকর উক্তি অগ্রজ-অনুজ নির্বিশেষে সকলের প্রতি করার জন্য পঞ্চাশের কিছু লেখক যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছেন। তবু এসবের মধ্যে একধরণের পাগলামি ও চতুরতা – নিজের ইমেজ সৃষ্টি ও স্বল্পশ্রমে খ্যাতিলাভের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না বলেই মনে হয়।
>
> কিন্তু তরুণ লেখকদের সোচ্চার আত্মপ্রকাশ ও পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধতা করার চিরকালীন প্রবণতাকে ব্যবহার করে রমা ও পবিত্র বেশ পরিকল্পিত ও শিল্পসম্মতভাবে ওদের ব্যক্তিগত ক্ষোভকে প্রকাশ করল। ওরা ক্রমাগত প্রচার করতে লাগল – ষাটের তরুণ কবিরা সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশের লেখক ও কবিদের দ্বারা অপমানিত, নিগৃহীত ও উপেক্ষিত। সুতরাং, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই ষাটের লেখকদের স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। পূর্ববর্তী সাহিত্যকার ও সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে নতুন রীতি ও প্রকরণ প্রণয়ন ও প্রচারের দ্বারা সাহিত্যে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সব যুগে সব লেখকদেরই থাকে। সুতরাং ষাটের সেই সময়ের মুখ্য সব লেখকই এই উদ্যোগে সম্মিলিত হলেন।
>
> এইভাবে ষাটের দশকের প্রথম সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়। কিছু সুবিধাবাদী লেখক সতীর্থ তরুণদের ভাবাবেগ ও উত্তেজনাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছিল। অবশ্য তার সঙ্গে নিজেদের আন্তরিক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। যথেষ্ট

ইতিবাচক তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিতর্কের সঙ্গেই তাই একটা সময়ে পঞ্চাশের কিছু লেখকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অতর্কিত অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য আন্দোলনকারীদের অতিরিক্ত উদ্দেশ্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করেছে।[৩৪]

তাই এই সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের মধ্যে কতটা তারুণ্যের ঝাঁজ ছিল, আর কতটা তাঁরা সাহিত্যে প্রথার বিরুদ্ধে একান্ত মনে সরব হয়েছিলেন, সাহিত্যের বাঁকবদলে তাঁরা কতটা আগ্রহী ছিলেন – এই প্রশ্নগুলি তাঁদের সম্পর্কে বারবার ঘুরেফিরে আসে। অশোক চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি নিজেও ঐ সময় এমন অনেক লেখালেখি করেছেন যেগুলির মধ্যে কিছু আতিশয্যও ছিল। কবিতায় ছবির ব্যবহার, স্পেস, যতিচিহ্নের লোপ, বা গল্পে কাহিনিহীনতা, উত্তেজক ও আকর্ষক স্লোগান – সবই সস্তা চটক বলে বহুবার নিন্দিত হয়েছে। তাঁর মতে "তরুণতর ষাটও ঐ সময়ে বিতর্কিত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই এমন অনেক কান্ড করেছে যার অনেকগুলিই অনেক সঙ্গত কারণেই সঙ্গতিহীন ও দৃষ্টি আকর্ষণের স্থূল উপায়।"[৩৫] কিন্তু কেউ কেউ নিশ্চয়ই সৎ ও আন্তরিক ছিলেন। 'শ্রুতি : ফিরে দেখা' শীর্ষক প্রবন্ধে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

তবে ফিরে দেখতে গিয়ে একটা সত্য অনুভব করছি – আমরা সৎ ও আন্তরিক ছিলাম। কবিতার জন্য আমরা যা করেছি, তা কবিতার জন্যই করেছি, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিনি। মনে রাখা দরকার, একদল তরুণ কবি, যারা তখন প্রতিষ্ঠিত, যারা তখন অজস্র পত্রপত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখেছে, যারা চাইলে প্রথানুগ লিখে জনপ্রিয় হতেই পারত, তারা স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে আদর্শের তাড়নায়, নতুন কিছু করার আকাঙ্খায় শ্রুতি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল, স-ইস্তাহারে কাব্য আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যথাসময়ে (হয়তো অদূর, হয়তো অতিসুদূর ভবিষ্যতে) এই আন্দোলন ও তার সঙ্গে সংযুক্ত কবিদের যথাযথ মূল্যায়ণ হবেই। যে শঠতা, যে শত্রুতা, যে উদাসীনতা আজ আমাদের অবহেলা ও অনাদর দিচ্ছে, তা একদিন নিষ্ক্রিয় হবেই। আর যে কটা দিন জীবিত থাকবো, সে কটা দিন এই সান্ত্বনা নিয়েই লিখে যেতে হবে – আমি মৃতদের জন্য কবিতা লিখেছি। আজ ৩৪/৩৫ বছর পরে মনে হচ্ছে শ্রুতির মাধ্যমে যা করেছি, তার অনেক কিছুই এখনও আধুনিক, সামান্য কিছু হয়তো এখন আর মানি না – কিন্তু আমাদের কাব্য আন্দোলন নিষ্ফল হয়নি বলেই মনে হয়। বাংলা কবিতা যে আমাদের মাধ্যমে নতুন মাত্রা পেয়েছে, তার সবচেয়ে প্রমাণ, আমরা এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, এত কোণঠাসা হয়েও আজও লিখছি। তথাকথিত প্রকাশকদের বিমুখতা পেয়েও আমাদের গ্রন্থপ্রকাশ স্তব্ধ হয়ে যায় নি। সবচেয়ে বড় কথা, সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও আমরা এক সৎ ও তন্নিষ্ঠ পাঠকগোষ্ঠী পেতে সক্ষম হয়েছি, যারা আমাদের লেখা পড়ে, আমাদের বই কেনে, আমাদের লিখে চলতে অনুপ্রাণিত করে। আর এটাই বা কম কি?

বাংলা সাহিত্যে আমরাই এটা প্রথম করেছি, ওটা প্রথম করেছি (যদি তা করেও থাকি), তা চিৎকার করে বলাটা রুচিহীনতা, অশোভনতা। দল গড়ে, চমক সৃষ্টি করে, কবির ব্যক্তিজীবনের গালগল্পকে রাষ্ট্র করে হয়তো জনপ্রিয়তা সস্তা খ্যাতি পাওয়া যায়, তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। কেননা কবি ও কবিতার চূড়ান্ত সমালোচক হচ্ছে – সময়। আজ যা কাছে আছে, কাল তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে; কাল যা দূরে ছিল, তাকেই হয়তো তখন কাছে টেনে নেবে।[৩৬]

অন্যদিকে 'সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, এক কিশোর ও শ্রুতি আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবালকুমার বসু শ্রুতির ব্যর্থতার অন্যতম এক কারণ হিসেবে পাঠকের সঙ্গে 'কম্যুনিকেট' করতে না পারার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে পাঠক প্রত্যাখ্যান করবেই। ভাষা সংস্কৃতির বাহক। প্রত্যেক ভাষার এক নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, সংস্কৃতি আছে। সেই সংস্কৃতি থেকে গড়ে ওঠে অভ্যাস। এই অভ্যাস পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হতে পারে। ভাঙতে গেলে প্রতিরোধ তো আসবেই। কবিতার মধ্যে শ্রুতি আন্দোলনের কেউ কেউ শব্দের জায়গায় বসালেন ছবি। অর্থাৎ মনের ভাব ওই ছবির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চাইলেন, যা শব্দের মাধ্যমে অন্যথায় ব্যক্ত হবার কথা। তাতে তো কবিতা আর কবিতা থাকল না। পাঠক তো কবিতা পড়তে চায়, কবিতা দেখতে চায় না। কবিতা দীক্ষিত পাঠকের ভিতরে এক বোধের জন্ম দেয়, যে বোধ তাকে সাহায্য করে নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে। এই নিজেকে আবিষ্কারই শিল্পের আনন্দ। এর জন্য কম্যুনিকেশন অত্যন্ত জরুরী।"[৩৭] কিন্তু শ্রুতি কবিতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এই ব্যাখ্যা সমর্থন করা সম্ভব হল না বর্তমান গবেষণায়। কারণ শ্রুতি কবিতার চিত্রধর্মীতা পাঠকের কাছে কীভাবে কবিতার ভাবটি বোঝবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে, তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। সত্য গুহ তাঁর 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' গ্রন্থে শ্রুতি কবিদের সম্পর্কে বলেছেন, "কোনো একটি মুহূর্তের মানসিক অবস্থার বা পরিবেশের অবস্থাগত অবয়বের যথাযথ চিত্রাভিব্যক্তির মধ্যে থেকেই সময় দূরত্ব স্বর মেজাজ প্রভৃতিকে একসঙ্গে উপস্থাপনের জন্যে এঁরা অল্পবিস্তর সবাই সচেষ্ট। ... এঁরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই ইঙ্গিতবহ, সাংগীতিক, রহস্যময় অন্তরলোক প্রকাশ করেছেন সমস্ত কবিতার মধ্যে। আমি দেখেছি, যে কথা তাঁরা বলতে চান, – যার দিকে ইঙ্গিত করতে চান, যতই সেভাবে বলার প্রতি বিরোধী হওয়া যাক না কেন, তাঁদের কবিতা পাঠকালে তাৎক্ষণিকের জন্যেও অন্ততঃ সেই অনুভূতির সঙ্গে একান্ত হয়ে যেতে হয়। সূক্ষ্ম অনুভূতির যে কাজ তাঁরা দেখান তাকে তারিফ না করে উপায় থাকে না।"[৩৮]

'শ্রুতি' থেমে যাওয়ার পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলিকে এখানে তুলে ধরা যাক এক শ্রুতি কবিরই বয়ানে। 'শ্রুতি : ফিরে দেখা'[৩৯] শীর্ষক প্রবন্ধে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

(ক) আমাদের সৎ স্বপ্ন ছিল, তা বাস্তবায়িত করার মত চাতুর্য ছিল না।

(খ) আমাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যত প্রখর ছিল, দলীয় ঐক্য রাখার প্রয়াস তত প্রখর ছিল না।

(গ) আমাদের কারো কারো অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের আন্দোলনের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল।

(ঘ) সাহিত্য কর্মের একটা প্রচারের দিক থাকেই, সে ব্যাপারে আমরা গুরুত্ব দিইনি বা দেয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। হাংরি কবিতা আন্দোলনের কবিরা ব্যাপক প্রচার কর্ম চালিয়ে কাজে নেমেছিলেন। আমরা অবশ্য কোনো রকমের লোকদেখানো চমকের আশ্রয় নিতে চাইনি।

(ঙ) যৌবনের স্পর্ধায় আমরা এমন অনেক কিছু করেছি যার ভালোমন্দ দুই ফলই আমাদের ভোগ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা মিত্রের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়েছি।

(চ) আমাদের সততা ও আন্তরিকতা অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত ফল ফলিয়েছে।

(ছ) আমরা বোধ হয় অকালে, বেশ আগেই, বাংলা সাহিত্য জগতে এসে পড়েছিলাম। জমি তখনও বোধ হয় চষা হয় নি। তাই সঙ্গে সঙ্গে ফলও পাইনি।

কালের নিয়মে শ্রুতি আন্দোলন একটা সময় থেমে গেলেও, এই আন্দোলন যে আধুনিক বাংলা কবিতাকে একটা নতুন রূপ দিয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রুতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে এখন পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক কবিতায় দেখা যায় শ্রুতির অনুসরণে কবিতা সাজানোর প্যাটার্নটা বদলে গিয়েছে। 'কৃত্তিবাসে'র থেকে 'শ্রুতি' এখানেই আলাদা হয়ে যায়; 'রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে রমানাথ রায় বলেছেন, "কৃত্তিবাস কোনো আন্দোলন নয় – ওটা একটা প্ল্যাটফর্ম। বেশিরভাগ প্রাচীনপন্থী

কবিরা এসে – যাদের মধ্যে নতুন কোনো ভাবনা ছিল না – তারা ওখানে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু শ্রুতির কাজ কবি জড়ো করা ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল কবিতার ধারাকে বদলে দেওয়া।"[৪০] শ্রুতি কবিরা তাই বাংলা সাহিত্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ কবি, নতুন ধারার কবি। একাধিক ক্ষেত্রে শ্রুতির কবিগোষ্ঠীর প্রয়াস আধুনিক বাংলা কবিতা-রচনার ধারায় বেশ কিছু সদর্থক প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাব যেমন গোষ্ঠীগত পরিসরে পড়েছিল, তেমনই আবার ব্যক্তি-লেখকদের মধ্যে অনেকের লেখাতেই শ্রুতিদের উত্তরাধিকারের চিহ্ন কম-বেশি চোখে পড়ে মাঝে মাঝেই।

প্রথমে আসা যাক, গোষ্ঠীগত পরিসরে প্রভাবের কথায়। 'শ্রুতি' কবিতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শ্রুতি'র বাইরেও কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সর্বদা সচেতনভাবে সক্রিয় থেকেছেন। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি ও আরেক অন্যতম প্রধান শ্রুতিকবি পরেশ মণ্ডল 'ঈগল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। কবিতার সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধও থাকত এই পত্রিকায়। অবশ্য 'শ্রুতি' ও 'ঈগল'-এর চরিত্র ঠিক এক ছিল না; 'ঈগল' ছিল একটু উচ্চকণ্ঠ, কিছুটা স্পর্ধিত।

এছাড়া আরও একটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি 'ধ্বংসকালীন' আন্দোলন। এই আন্দোলনের সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গেলেই, তার আগে অনিবার্যভাবে আসে পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর 'কবিপত্র' পত্রিকার কথা। অবশ্য প্রথমদিকে কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জনের ব্যস্ততা ছিল না এই পত্রিকার। কবিতা সম্পর্কে সার্বিক প্রীতি ও মুক্ত মন নিয়ে এই পত্রিকাটিকে গড়েছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল দত্ত। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাটের দশকের কবিদের কবিতা প্রচুর ছাপা হয়েছে এই পত্রিকার পাতায়। এই খোলামেলা ভাবটিই ছিল প্রথম পর্বের 'কবিপত্রে'র বিশিষ্টতা। তবে ১৯৬৬ সাল থেকে এই পত্রিকা ধীরে ধীরে একটু স্বতন্ত্র চেহারা নিতে থাকে। 'ষাট দশকের বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী অনুমান করেছেন, "হয়ত 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি'-র যৌথ আন্দোলনের কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল এই পরিবর্তনের মূলে।"[৪১] এই সময় 'ধ্বংসকালীন' আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে উঠল 'কবিপত্র' পত্রিকা। পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, "হাংরি জেনারেশন কবিদের মতো আতিশয্যময় না হলেও সমকালীন সমাজ-জীবনের ক্লেদাক্ততার উপমারূপে যৌন-প্রসঙ্গের ব্যবহার এই কবিরা ব্যাপকভাবেই করেছেন।"[৪২] আমরা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'ইবলিশের আত্মদর্শন'-এ পড়েছি এমন পঙ্‌ক্তি, "ঈশ্বরের মুখ ভাবলে চিন্তায় বা অনুভবে অক্ষত যোনির ছবি ভাসে।"[৪৩]

আবার ঠিক সাহিত্য-আন্দোলনের মতো না হলেও, এখন 'অ্যান্টিপোয়েট্রি' বলতে আমরা যা বুঝি, তার সূত্রপাতও কিন্তু শ্রুতি থেকেই। রমানাথ রায় 'বিশেষ করে পুষ্করের কবিতা থেকেই অ্যান্টিপোয়েট্রির জন্ম'[৪৪] বলে মনে করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি সুবোধ সরকারের কথা, যাঁর কবিতায় আমরা দেখি "অ্যান্টি-পোয়েট্রির নগ্ন নিরাভরণ যুক্তিগ্রাহ্য ভাষা, যার গা থেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাবতীয় প্রতিমা আর অলংকার, ভেতর-বিন্যাসের মধ্যে টের পাচ্ছি দৈনন্দিন শ্বাসপ্রশ্বাসের অবিরল উত্তাপ, অপাবৃত গদ্যের অন্যরকম হাওয়া।"[৪৫]

কেবল গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রেই নয়, এককভাবেও অনেক কবি প্রভাবিত হয়েছেন 'শ্রুতি' কবিতা-আন্দোলনের দ্বারা। শ্রুতি কবিরা শব্দের তাৎপর্যময় বিন্যাসে, কবিতার নতুন ভাষা-অবয়ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থাৎ শব্দের বিন্যাসে ও বাক্যের অন্বয়ে সচেতন বিপর্যয় ঘটিয়ে কবিতার ভাষাকে নতুন করে তোলার সাহস দেখিয়েছেন। উচ্চারণের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে কেটে কেটে দিয়েছেন তাঁরা। এক একটি শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্যাংশকে স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তিতে বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করে, শব্দকে একক মর্যাদা দিতে চাইলেন তাঁরা, আর তখনই তাঁদের কবিতার ভাষায় অন্য এক দিগন্ত উন্মোচিত হল। 'শ্রুতি : একটি কবিতাপত্র : একটি আন্দোলনের প্রয়াস' শীর্ষক প্রবন্ধে অরুণকুমার ঘোষ বলেছেন –

> একটা নির্দিষ্ট কাব্যরূপের (যেমন সনেট বা সনেটকল্প চতুর্দশপদী) সংকীর্ণ আয়তনে নিজের স্বাধীন কবিকল্পনাকে বন্দী করে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক উচ্চারণের গতানুগতিকতা যে অনেকের লেখাতেই তখন দেখা যাচ্ছিল তার প্রতিষেধক হিসেবে শ্রুতির কবিগোষ্ঠী কবিতার খোলামেলা রূপের সন্ধান, কবিতার প্রকরণ নিয়ে স্বাধীন, সজীব পরীক্ষানিরীক্ষার প্রবণতাকে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া একধরণের গুরুগম্ভীর, অনড় কাব্যিক ভাষাব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল অনেকের লেখায়।[৪৬]

ঐ সময়ের কিছু কবির আগেকার কবিতার পাশে তাঁদের পরের কবিতা রেখে নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলে মনে হতে পারে যে, শ্রুতির কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টান্তে প্রাণিত হয়েই সম্ভবত তাঁরা আগেকার সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ কাব্যরূপ ও গুরুগম্ভীর অনড় কাব্যিক ভাষা বর্জন করে কবিতার খোলামেলা বিচিত্র রূপ, সজীব কাব্যভাষার তথা উচ্চারণের সন্ধানে ফিরেছেন। আরো একটা ব্যাপার, শ্রুতির কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে কেউ কেউ কবিতার রূপকল্পগত কিছু কিছু কৌশল গ্রহণ করেছেন। যেমন রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় স্পেস-এর যে তাৎপর্যময় ব্যবহারের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা সম্ভবত পরেশ মণ্ডল প্রভৃতি শ্রুতির কবিদের কাছ থেকেই তিনি নিয়েছেন। 'অপরূপ ভাষাচিত্র : মৃণাল বসুচৌধুরীর

কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে সুজিত সরকার বলেছেন "রত্নেশ্বর হাজরা এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও তাঁর কবিতা পড়ে ও তাঁর কবিতার বিশিষ্ট আঙ্গিক লক্ষ করে তাঁকে আমার এই আন্দোলনের শরিক বলে মনে হয়েছে।"[৪৭] রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় আমরা শ্রুতির মতো টাইপোগ্রাফির প্রয়োগ দেখি প্রায়ই। তাঁর 'কেউ বাড়ি নেই', 'অল্প অসীম', 'অফিস যাওয়া', 'অঙ্ক শেখা', 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি প্রচুর কবিতায় বোল্ড হরফের প্রয়োগ দেখি আমরা। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। শ্রুতিদের মতো এক শব্দের পঙ্‌ক্তিও দেখা যায় তাঁর বেশ কিছু কবিতায়। যেমন, 'বৃষ্টি'[৬২] কবিতাটি। আবার 'মহাভারত' কবিতাটিতে সেনা-সজ্জার কথা বলতে গিয়ে পঙ্‌ক্তিগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা-সজ্জার একটি 'Sky-view' ফুটে উঠেছে –

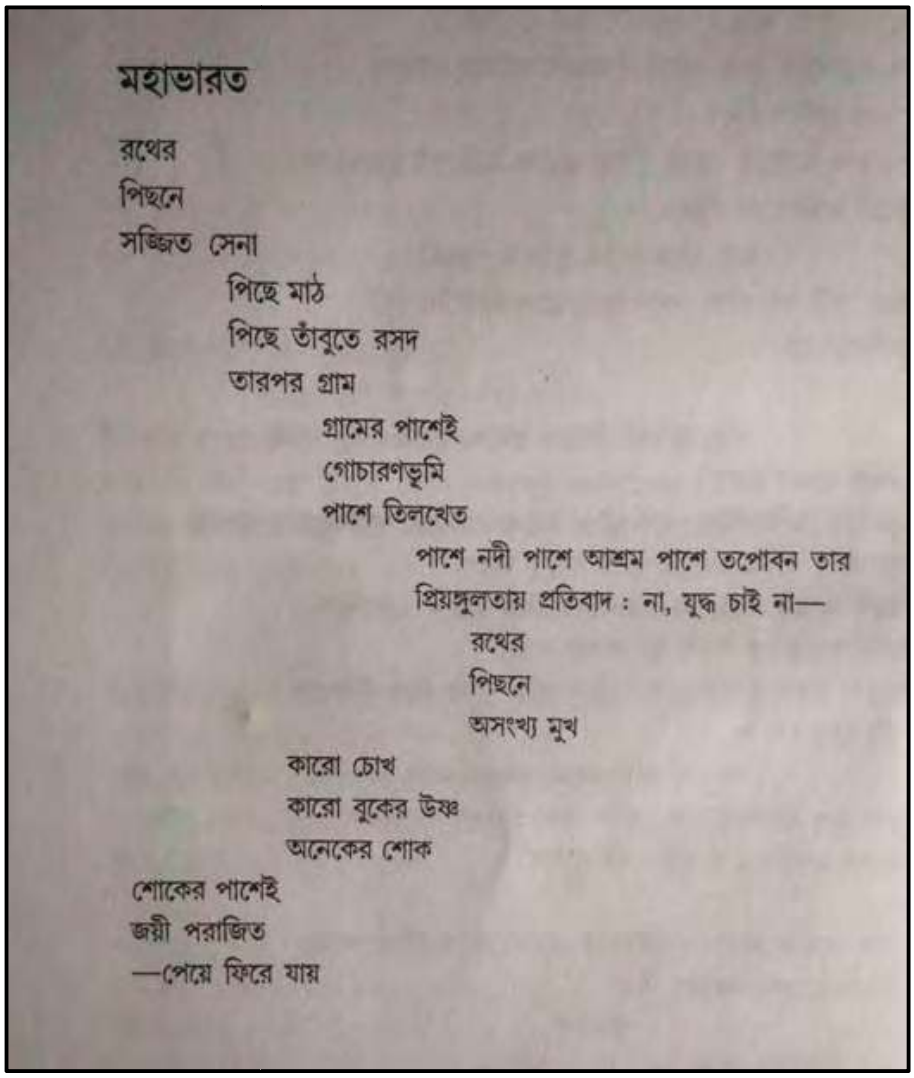

মহাভারত

রথের
পিছনে
সজ্জিত সেনা
পিছে মাঠ
পিছে তাঁবুতে রসদ
তারপর গ্রাম
গ্রামের পাশেই
গোচারণভূমি
পাশে তিলখেত
পাশে নদী পাশে আশ্রম পাশে তপোবন তার
প্রিয়ঙ্গুলতায় প্রতিবাদ : না, যুদ্ধ চাই না—
রথের
পিছনে
অসংখ্য মুখ
কারো চোখ
কারো বুকের উষ্ণ
অনেকের শোক
শোকের পাশেই
জয়ী পরাজিত
—পেয়ে ফিরে যায়

'মহাভারত' – রত্নেশ্বর হাজরা[৪৮]

শ্রুতির বিরোধীপক্ষদের প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে এরা নাকি ইউরোপীয় কবিদের কংক্রীট-পোয়েট্রি আন্দোলনের অনুকারী। 'শ্রুতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রভাত চৌধুরী এর যোগ্য জবাব দিয়ে বলেছেন, "তাতেই বা ক্ষতি কী। ৩০-এর কবিরা যদি ইয়েটস মালার্মে এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করে বাংলা কবিতায় স্মরণীয় হয়ে ওঠেন, কিংবদন্তি হয়ে যান – তাহলে শ্রুতির কবিরা কী দোষ করেছিল। পুষ্কর, পরেশ, সজল কিংবা মৃণাল ইউরোপের কবিতা অনুবাদ করে নিজেদের নামে প্রকাশ করেছিলেন – এই অভিযোগ অতি বড়ো নিন্দুকও করার সাহস পায়নি।"[৪৯] ষাট-সত্তর দশকের শ্রুতি ও অন্যান্য কবিতা-আন্দোলনগুলিকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে না পারলে বাংলা সাম্প্রতিক কবিতাকে বোঝা সম্ভব হবে না। এই অসমাপ্ত কাজটি করার পরই আধুনিক থেকে উত্তর-আধুনিক কালখন্ডে পৌঁছতে পারবে বাংলা কবিতার পাঠক। কবিতার তথাকথিত ভাষারীতি পাল্টে ফেলে অন্যতর বাক্-ভঙ্গিমা আমরা টের পাই অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর উত্তর-আধুনিক কবিতায়। আধুনিকতা অর্থে আত্মমগ্নতার একান্ত অভিমুখীনতা, মনোরাজ্যের বাধাহীন বিস্তার, যেখানে যৌনতার অনুপ্রবেশ অবাধ – মূলত আধুনিক কবিতার এই প্রবণতাগুলিকেই তাঁরা আক্রমণ করেছেন। দেশজ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের সর্বাত্মক গ্রহণ – সেই সঙ্গে বিশ্ব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, সংহত উপলব্ধির সঙ্গে মেধা ও মননসঞ্জাত দীপ্তির মেলবন্ধনে কবিতা গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। আধুনিক কবিতা এভাবেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়' গ্রন্থে বলছেন, "আধুনিক কবিতাকে মনে হয় সে যেন কোনো সময়েই পরিপূর্ণ নির্মাণ বা 'product' নয়, সব সময়েই নির্মীয়মান বা 'process'।"[৫০] শ্রুতি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে শ্রুতি সম্পর্কিত আলোচনার ইতি টানা যাক –

> কবিতায় কোন তথাকথিত বক্তব্য বা বাস্তব অর্থ থাকে না, থাকে কবির বিচিত্র অনুভব সমন্বিত স্বপ্নময় আত্মিক আবহের প্রকাশ। পদ্য সহজ হতে পারে, সহজ কবিতা বলে কিছু হয় না। আবার তথাকথিতভাবে 'দুর্বোধ্য কবিতা' বলেও কিছু হয় না। কারণ, কবিতার সঙ্গে 'বোঝার' কোন সম্পর্ক নেই, কবিতাকে উপলব্ধি করতে হয়।
>
> (শ্রুতি-২, সম্পাদকীয় নিবন্ধ)

৩। শাস্ত্রবিরোধী

> গল্পকারেরা এর মধ্যে নতুন পথের সন্ধান করবেন, এটাই স্বাভাবিক। ... একদা নতুন রীতির গল্প পুরোন রীতিতে পরিণত হয়।[৫১]

ঠিক এভাবেই শাস্ত্রবিরোধিতাও যখন শাস্ত্রে বা নিয়মে পরিণত হয়ে ওঠে, তখন সেই শাস্ত্র বা নিয়মকেও ভাঙার দরকার হয়। 'বাংলা ছোটগল্পের বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেবর্ষি সারগী শাস্ত্রবিরোধী গল্প পাঠের স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, "শাস্ত্রবিরোধী গল্প সম্পর্কে আমার ক্রমশ মনে হতে লাগল লেখাগুলি যেন একটু পুনরাবৃত্তিক হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়েও যা বেশি করে মনে হতে লাগল সেটা হল, সবাই মিলে যেন প্রায় একইরকম গল্প লিখে চলেছেন। এই মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীরা যেন মাঝে মাঝেই কোনও গোপন সমাবেশে মিলিত হয়ে ঠিক করে নেন পরবর্তী সংখ্যার গল্পগুলি সবাই কেমন লিখবেন। নিজের নিজের ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের চেয়ে যেন গোষ্ঠীগত সাদৃশ্যের দিকেই এঁরা বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করলেন।"[৫২] অবশ্য সব আন্দোলনই শেষপর্যন্ত এইরকম একটা একস্তরীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সাদৃশ্য বা ঐক্য একটা বড় গুণ বলে বিবেচিত হয় এবং সাফল্যের জন্য সেটা কাম্যও বটে; কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে এই ঐক্য নিশ্চয়ই প্রার্থিত নয়; সেখানে মহৎ ও মৌলিক সৃজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দাবি করে। তাই আমরা দেখি একটা সময়ের পরে শাস্ত্রবিরোধীরা গোষ্ঠীমুক্ত হয়ে নিজের নিজের পথে পা বাড়ালেন। দেবর্ষি সারগী অনুমান করেছেন, "গোষ্ঠীভঙ্গের পেছনে নিশ্চয়ই এই ভাবনা এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করেছিল যে, তাঁকে এবার আলাদা কিছু করতে হবে, যার সঙ্গে অন্য সহযাত্রীদের মিল নেই। এবার গান গাইতে হবে একেবারে নিজের কণ্ঠস্বরে। এবং একক অনুষ্ঠানে। আর কোরাস নয়।"[৫৩] আমরা পরবর্তীকালে এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেককেই নিজস্ব পথ নির্মাণ করে নিতে দেখেছি। এপ্রসঙ্গে শেখর বসুর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রভাতকুমার দাস 'অনুভূতির জগতের বাস্তবতা শেখর বসুর গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন –

> এই আন্দোলনের শরিকদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই পাঠকমহলে বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছেন। এঁদেরই একজন শেখর বসু, প্রথম থেকেই অত্যন্ত সচেতনভাবেই নিজস্ব পথ নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হয়নি। তথাকথিত বাণিজ্যিক পত্রিকাতেও তিনি লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, সমান্তরাল সাহিত্য আন্দোলন তথা শাস্ত্রবিরোধীদের অন্যতম প্রবক্তা – এই দুই ভিন্ন স্রোতধারায় তাঁর

লেখা প্রবাহিত হয়েও তাঁর নিজস্বতার ধারাবাহিকতা কোনো প্রচ্ছন্ন ভেদরেখা তৈরি করেনি।[৫৪]

এছাড়া 'এই দশক' পত্রিকার সংকলনগুলি লক্ষ করলেই মতাদর্শগত দিক থেকে তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার বিরোধও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখি 'এই দশক'-এর পঞ্চম সংকলনে রমানাথ রায় 'পরীক্ষামূলক সাহিত্য' কথাটাকে নির্বোধের উক্তি বলে চিহ্নিত করছেন এবং সেই সঙ্গে এও বলছেন যে সাহিত্য আর যাই হোক গবেষণাগার নয়। অথচ 'এই দশক' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে সুব্রত সেনগুপ্ত 'আধুনিক গল্পের ভূমিকা'-তে উল্টো কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে শিল্পের প্রাণ নতুন নতুন পথ খোঁজা, অন্বেষণ, পরীক্ষায় নিহিত। রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধিতা থেকে সরে গিয়েছেন এক সময়, কিন্তু অনেকেই এই মতাদর্শে সৎ থেকেছেন আগাগোড়া। শেখর বসু তাঁর 'লেখা ও লেখক' গ্রন্থের 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প আন্দোলন আমার কাছে দ্বিস্তর মহাকাশযানের মতো। আন্দোলনটি উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশের একটি সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তারপর আর একটি বিস্ফোরণ। আধারটি খসে পড়ে এবং মূল মহাকাশযানটি ছুটে যায় আরও উঁচুতে, লক্ষ্যের দিকে। ওই আধারটি হল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, যেটি কার্যকর ছিল মহাকাশের বিশেষ এক সীমানা পর্যন্ত। আধারের কাজ ফুরিয়েছে, মূল মহাকাশযান এখন লক্ষ্যপথে।"[৫৫]

আবার আমরা দেখেছি, 'এই দশক' পত্রিকার অষ্টাদশ সংকলন থেকে বলরাম বসাককে আর লেখক হিসাবে পাওয়া না গেলেও তিনি শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যচর্চা করে গেছেন পরবর্তী সময়ে। 'এই দশক' গোষ্ঠীর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়ে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে তিনি প্রচলিত রীতির বাইরে বাংলা ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। 'এই দশক এবং বলরাম বসাকের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত 'গল্প-সভা' এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত 'মুক্ত গল্প সভা'র আয়োজন ও পরিচালনার মাধ্যমে তিনি আধুনিক গল্প-গল্পকার এবং পাঠকের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করে আড্ডার পরিবেশে সংস্কারমুক্ত গল্পচর্চার ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন। আন্দোলনের বাইরে দাঁড়িয়েও তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন শাস্ত্রবিরোধী মন।"[৫৬]

একথা ঠিক যে, প্রচলিত বাংলা ছোটগল্পে অনুসৃত ও চেনা যাবতীয় চলনভঙ্গিকে অস্বীকার করে, প্রচলিত সব শর্তকে নস্যাৎ করে শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা যখন নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন পথে এগিয়েছেন, তখন নবীন তেজের ঈষৎ ঔদ্ধত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায়

ঘোষিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু সেই প্রাথমিক উত্তেজনাও এক সময় স্তিমিত হয়ে পড়ে। 'আশিস ঘোষের শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে অলোক রায় বলেছেন, "আসলে আন্দোলনের উত্তেজনা বেশি দিন থাকে না, 'এই দশক' নামের মধ্যেই তার পরিচয়। তবে গল্পকার তো গল্প লেখা বন্ধ করেন না, লেখার ঢঙ ও রীতি বদলে যেতে শুরু করে।"[৫৭]

এ'কথা ঠিক যে, শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি সাধারণ পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তবে তার জন্য সাধারণ পাঠকের রুচিই বহুলাংশে দায়ী। 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, "শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের লেখার মধ্যে কিন্তু মোটেই দুরূহতা নেই। তাঁদের লেখা মনোরঞ্জক গল্প-খোর পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তার কারণ দুরূহতা নয়, তার কারণ সে সব লেখায় একটি ঘটনাবহুল সূত্রপাত থেকে ঘটনা সমাপ্তির শেষ বিন্দুটি কারণ-কার্য শৃঙ্খলায় গ্রথিত ঘটনা-বিন্যাসরূপে পরিকল্পিত হয় না। সোজা কথায় গল্পের মধ্যে কোনও 'গল্পই' নেই।"[৫৮] আমরা দেখি অতীন্দ্রিয় পাঠক তাঁর 'প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনের গল্প' গ্রন্থে 'লেখকের নিবেদন' অংশে পাঠকের কাছে তাঁর গল্পগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন,

> প্রাকৃত জীবনের গল্পগুলি কোনো-কোনো পাঠকের মনে সংবেদী হলেও হতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত জীবনের গল্পগুলি আদৌ সংবেদী হবে কিনা – সন্দেহ আছে। কেননা, তার জন্য পাঠককে আমার সম-মানসিকতায় আসতে হবে – অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী তা দুরাশা বলাই সঙ্গত। সেক্ষেত্রে, গল্পগুলি না-হয় আমার নিজস্ব মানসিক-দার্শনিক অস্তিত্বের ধারক হয়েই থাকুক – নিজের কাছে সেটিও কম মূল্যবান নয়।[৫৯]

এখানে 'প্রাকৃত জীবন' বলতে লেখক বুঝিয়েছেন, যে-জীবনপ্রবাহ আমাদের সামনে বহমান। আর 'অপ্রাকৃত জীবন' বলতে বুঝিয়েছেন লেখকের সেই অন্তরঙ্গ জীবনকে যা সরাসরি প্রত্যক্ষ না হলেও অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে লেখক তা অনুভব করেন। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি যে সম্পূর্ণতই পাঠকনির্ভর এবং নির্দিষ্ট পাঠকের জন্যই লেখা, যে-কোন পাঠকের বোঝার মতো নয় এই গল্প,[৬০] তা স্বীকার করেছেন দেবেশ রায়ও। তিনি আরও বলেছেন –

> 'শাস্ত্রবিরোধী' বা 'বিধিবিরোধী' গল্পের এটাই হয়তো লক্ষ – তাঁরা গল্পই লিখতে চান, গল্পই লেখেন, কিন্তু গল্প বলতেই যে একটা গঠন প্রচল আছে সেটাকে ভাঙতে চান, আর যেহেতু গঠনের বাইরে গল্প কোথাও থাকে না, তাই তাঁদের গল্প অচেনা, অন্যরকম ও অর্থান্তরিত হয়ে ওঠে।"[৬১]

কেবল সাধারণ পাঠকই নয়, 'এই দশক এবং বলরাম বসাকের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বলরাম বসাকের 'কার্পেট' গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন –

শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনকারীদের সাফল্য আর মুগ্ধ সমালোচনার বাইরে দাঁড়ালে এ গল্প সম্পর্কে কিছু অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নকে বোধহয় এড়ানো যায় না। 'কার্পেট' গল্পে বলরাম সাদা কাগজকে ভরিয়ে তুলেছেন আপন খেয়ালে বৈচিত্র্যহীন শব্দসজ্জায়। গল্পটি পড়ে যা অনুভূত হয় তা লেখকের উদ্ভট কল্পনার কষ্টসাধ্য পাঠোদ্ধার। সাদা কাগজকে তো সাদা চোখে দেখেই বোঝা যায় সেটা গল্প নয়, কিন্তু কিছু শব্দকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সাজিয়ে তাকে গল্প প্রমাণ করার চেষ্টা করলে সেটাকে অস্বীকার করা পাঠকেরও ভাবনার বিষয় হয়ে যায়। গল্পটির পক্ষে দাঁড়িয়ে অনেক কথা হয়তো বলা যায়। প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় গল্পটি কতখানি শাস্ত্রবিরোধী। কিন্তু গল্প তো নিজেই নিজেকে প্রমাণ করে। যা কিছু অভিনবত্ব তার সমস্ত দায় লেখক পাঠকের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। লেখকের সমস্ত কষ্টকল্পনা বোঝার দায়িত্ব পাঠকের নেই।"[৬২]

এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না কোনোভাবেই। আসলে এই গল্পগুলি পাঠকের প্রস্তুতি দাবি করে। সাধারণ পাঠক তাঁর পাঠ-অভ্যাস থেকে হয়তো এই গল্পগুলি পাঠে নির্দিষ্ট কোনো অর্থবোধে না'ই পৌঁছোতে পারেন। আক্ষেপের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, বাঙালি পাঠকের পাঠ-জগতের আরও একটু বিস্তার দরকার। আরও একটু ভাবা দরকার। আরামপ্রিয় বাঙালি পাঠক স্পষ্ট আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত নিটোল গল্পের বাইরে খুব একটা বেরোতে চান না। তাই শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলির মতো যে'সব গল্পের রস-আস্বাদন করা একটু আয়াসসাধ্য, সাধারণ পাঠক অধিকাংশক্ষেত্রেই সেখানে প্রকৃত রসের নাগালই পান না। ঋত্বিক ঘটক কি আর এমনই বলেছিলেন বাঙালিকে ভাবা প্র্যাকটিস করতে! খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা মোটা দাগের কোনো আখ্যান বোনেননি। আমার নিজস্ব পাঠনির্মাণে স্পষ্ট করে এটা মানে এই, ওটা মানে ওই – এমন গাণিতিক সহজ সমীকরণে বেঁধে বোঝার চেষ্টা করিনি এই গল্পগুলিকে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই লেখাগুলি পড়ে যতটা বুঝেছি, তাঁর থেকে অনেক বেশি এমনকিছু অনুভব করেছি, উপলব্ধি করেছি যা যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করা হয়তো সম্ভবপর নয়। পাঠকের পাঠ-নির্মাণের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে, এই গল্পগুলির বহুবিধ পাঠ-নির্মাণ করা যেতেই পারে, এই গল্পগুলি নিঃসন্দেহে 'Multidimensional'। শব্দচয়নেও এরা এতটাই সূক্ষ্মতা, সচেতনতা অবলম্বন করেন যে, এক একটি শব্দ থেকেই পাঠক পেতে পারেন নানা তল, নানা স্তর, নানা চেতনার বিচ্ছুরণ। এঁদের লেখা এতটা বহুমাত্রিক হলেও, পাঠ-স্বাধীনতার নামে পাঠ-বিকৃতি কখনই কাম্য নয়। কেবল পাঠ করতে জানলেই যোগ্য পাঠক হওয়া যায় না। এ'কথা মানছি যে, সাহিত্য লেখকের লেখনীনিঃসৃত হলেও, সাহিত্যের রসপরিণতি ঘটে পাঠকের মন ও মননে। কিন্তু সেই পাঠক কী যেই-সেই পাঠক হলেই

হয়? তা কিন্তু নয়। রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্র'-এর 'রসবিকল্প' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত মুনি একদা খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন –

> যথাহি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসনাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি।"[৬৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রসপরিণতির কথা বলতে গিয়ে ভরত মুনি কিন্তু দর্শকের আগে 'সুমনসঃ' বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুমনসঃ প্রেক্ষকা'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন 'সহৃদয় দর্শক'[৬৪]; অবন্তিকুমার সান্যাল করেছেন 'অনুকূলমনোভাবাপন্ন', ইংরেজিটিও তিনি উল্লেখ করে বলেছেন 'Well-disposed'।[৬৫] বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে, অনেকেই সংগীতপ্রেমী হলেও 'উচ্চাঙ্গ সংগীত' বা 'ধ্রুপদী সংগীত' শুনতে আদৌ পছন্দ করেন না। তা'ই বলে কী ধ্রুপদী সংগীত আস্বাদনের অযোগ্য? নাকি সেই শ্রোতা ধ্রুপদী সংগীতের 'সুমনসঃ' শ্রোতা নন! যে কোনো রসসৃষ্টিকে বুঝতে হলে আগে রসজ্ঞ হতে হয়, শিল্পকে বুঝতে হলে শিল্পের সমঝদার হতে হয়।

'পঞ্চাশৎ পরিক্রমা' গ্রন্থের 'ছোটগল্প ১' শীর্ষক নিবন্ধে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন — "এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন মূলতই আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তির অস্তিত্বকেন্দ্রিক। এঁদের অনেক গল্পে একটা সামাজিক ঘেরাটোপ থাকত ; কিন্তু ঝোঁকটা ছিল 'ব্যক্তি'-র ওপরেই। ... 'অতিরিক্ত' আত্মকেন্দ্রিক বলেই পাঠক সমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।"[৬৬] এই বক্তব্যকে আরেকটু টেনে বলা যায়, শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলির বিষয় অন্তর্বাস্তবতা হওয়ায় এবং সাধারণ পাঠককুল আদি-মধ্য-অন্ত্য নির্দেশিত প্লটযুক্ত আদ্যন্ত ঘটনাপ্রধান নিটোল গল্পপাঠে অভ্যস্ত হওয়ায়, এই গল্পগুলি সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। ফলত, এই লেখকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে "বড় পত্রিকার বাণিজ্য জগতের গহ্বরে ঢোকার আহ্বানে সাড়া দেন"[৬৭] বা দিতে বাধ্য হন, তবে তা কখনই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। 'ছকভাঙা গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপা দত্তভৌমিক বলেছেন, "ক্রমশ কিন্তু আমরা সুব্রত সেনগুপ্তের গল্পে কাহিনিকে স্পষ্টতর হতে দেখেছি। আবছা অবলম্বন বেশ খানিকটা জমাট বাঁধছে। প্রায় নিরাকার আখ্যান যান সাকারত্বে পৌঁছোচ্ছে। পুরোনো পথকে কিছুটা বদলে তিনি যেন বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে মেনে নিচ্ছেন। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা কি অনুভব করেছেন যতই প্রথা ভাঙায় সফল হোক তাঁদের চেষ্টা, পাঠকের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও আবেগ তাঁদের গল্পের নাগাল পাচ্ছে না, খুবই সীমিত পাঠক সংখ্যার গণিতে তাঁদের

প্রচেষ্টা আটকে যাচ্ছে। ... মশলামাখা কৃত্রিম নাটকে ভরা গল্পের কথা হচ্ছে না, জীবনের খণ্ডিত অসমাপ্ত রূপের সঙ্গে ছন্দ রেখে যে স্বাভাবিক গল্প উঠে আসে রোজ তার ভূমিকা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। পরিস্থিতি বা বিষয়ের নিবিড়তা আখ্যান কিছুটা ধরে রাখে, একেবারে প্লট হীনতায় পৌঁছলে নোঙর ছেঁড়া গল্প পাঠকের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে উধাও হয়ে যেতে চায়। লেখক ও পাঠকের সংযোগে একটা বড় ফাঁক এতে থেকে যেতেই পারে। পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতায় লেখকের সৃজনবিশ্বের সঙ্গে পাঠকের সৃজনশীলতা মিথ্যে শিল্পলোক গড়ে ওঠে, কোনও খাতিরেই এই যোগাযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। সম্পূর্ণ আখ্যান হীনতা তাই হয়তো সোনার পাথরবাটি হয়ে গেছে কিছুটা।"[৬৮] রমানাথ রায় বলেছেন — "বাজারের কথা ভেবে অর্থাৎ পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে যাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন তাঁরা প্রকৃত লেখক নন। প্রকৃত লেখক অন্তরের তাগিদ থেকে লেখেন। ... আমরা জনতার রুচি অনুযায়ী লিখতে চাইনি। আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী লিখতে চেয়েছি। এতে পাঠকেরা যদি সাড়া দেয়, তাহলে তা খুবই আনন্দের। কিন্তু সাড়া না দিলে আমাদের কিছু করার ছিল না।"[৬৯] দায় সাধারণ পাঠকের। ঊনবিংশ সংকলনের শেষে গ্রন্থ আলোচনা অংশে অতীন্দ্রিয় পাঠকের 'অন্তর্মুখ/পরিক্রমা' গল্পসংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে পরেশ মণ্ডল বলেছেন, "লেখকের কাজ কি পাঠকের পেছনে ছুটে মরা? না, পাঠককে তাঁর কাছে টানা? ... পাঠকের অতীত অভ্যাসকে মেনে নিয়ে নয়, নতুন অভ্যাসের সঞ্চার করে।"[৭০] তিনি আরও বলেছেন, "আমার অভিমত আমারই। আপনি তা মেনে নিন চাই না। আমি চাই আপনি বইটি পড়ুন, প্রশ্ন করুন, ভাবুন ও ভাবান। আশা রাখি, আপনার কাছ থেকে নতুন অভিমত জানতে পারবো। কেননা, রামকৃষ্ণের কথা মানি যে – "যার যেমন পুঁজি – জিনিসের সেই রকম দর দেয়।"[৭১]

আজকের বাংলা ছোটগল্প শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন পার হয়ে অনিবার্য বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই আন্দোলন পাঠকের পুরোনো পাঠাভ্যাসে জোর ঘা দিয়ে পারম্পর্যময় বাঁধা ফ্রেমের গল্পের বাইরেও যে অন্যতর কিছু আছে সে বিষয়ে তাকে সজাগ করেছে। 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে দেবেশ রায় স্মৃতিচারণা করে বলেছেন –

> ১৯৬৬ তেই জলপাইগুড়িতে পাতলা ছোট একটি কাগজ ডাকে এসেছিল। **'এই দশক'**। যদ্দূর মনে পড়ে, পাতা উলটে একটি গল্প পড়ে আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করি। যদ্দূর মনে পড়ে, গল্পটি ছিল রমানাথ রায়-এর 'বলার আছে'। ১৯৬৬ তে ওই গল্প পড়ে চমকে গেলাম আর বাংলা গল্পের বাঁধ তাহলে আরও ভাঙা গেছে ভেবে ফূর্তি পেলাম।[৭২]

কথক ঠাকুরের মত টানা গল্প বলার ধরনটি শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তারই প্রভাবে দেখি, আজকের গল্পকাররা অনেকেই আর বিবৃতিপন্থী নন। যে কোনো সাহিত্য পত্রিকা নিলেই দেখা যাবে, শুরু-মধ্য-শেষের শাস্ত্রীয় ছকে বাঁধা নিটোল গল্পের চেহারাটা বদলে গেছে। রবিন পাল 'দেবর্ষি সারগীর গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন-

> সত্তর দশকের শেষ থেকেই আমরা দেখব গল্পের প্রথাগত কাঠামো যেমন নানাভাবে ভাঙছে, গল্পে প্রচলিত বাস্তববাদ বলতে যা বুঝি তা-ও অনেকে অস্বীকার ক'রে অন্যপথে যাত্রা শুরু করেছেন।"[৭৩]

আজকের গল্পে আখ্যানের বুননের মধ্যেই ঢুকে পড়ে কল্পজগৎ, মগ্ন চৈতন্যের স্মৃতিপুঞ্জ। চেতন বিশ্বের সমান্তরাল নির্জ্ঞান স্তর আজ বাংলা গল্পে অনেক অনায়াস। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন এই ভাবে তার অস্ত্যর্থক ভূমিকা পালন করে গিয়েছে, প্রসারিত করে দিয়েছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা। তাই ষাটের দশকে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন যে প্রবল কোলাহল তুলে উপস্থিত হয়েছিল, সেই হইচই-এর প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। বহু সংখ্যক সাধারণ পাঠকের গল্পরুচির বিনোদনের দিকটা তৃপ্ত করার কোনো চেষ্টাই এই লেখকেরা করেননি। 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক বাজার-চলতি গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে অমল চন্দের একটি মজার উক্তি তুলে ধরেছেন। বাণিজ্যিক উপন্যাস সম্পর্কে একটি বিতর্কসভায় অমল চন্দ বলেছিলেন,

> আসলে সেই লেখাগুলি এতটাই কৃত্রিম, পাঠ করা দুঃসাধ্য। সেগুলি পাঠ করতে গেলে তার অনুবাদ করা দরকার, যাতে করে অনর্থক বিষয়গুলি বাদ দিয়ে, মূল বিষয়টা পাঠক ধরতে পারেন।
>
> এই বক্তব্য শুনে কেউ একজন প্রশ্ন করেন – তা হলে তাঁদের লেখার এত পাঠকগ্রাহ্যতা কেন ? বরং আপনারা যে ভাবে লিখছেন, সেটাই পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।
>
> অমল চন্দ সহজ ভাবেই এর উত্তর দিয়েছিলেন - এটা অভ্যেস খারাপ হয়ে যাওয়ার ফল। ওই লেখাগুলি পড়ে পড়ে পাঠক এমনই অভ্যস্ত – সেখানে অন্য সবকিছু আছে শুধু সাহিত্য নেই – সেটা বুঝতে পারে না। বরং আমাদের লেখা সরাসরি এবং এতটাই সহজ-সরল, সেই খারাপ অভ্যেসের ফলে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।[৭৪]

এঁরা পঠিত হননি বিপুলভাবে। তবু কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখলে অনুভব করা যায় বাংলা ছোটগল্পের পাঠক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত গল্পধারায় তাঁরা সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বিস্তৃত সময় ধরে

ধাক্কা মেরেছেন বাঙালি পাঠকের গল্প পাঠের চাহিদায়, বদলে দিয়েছেন গল্প বলার চেনা ধরন। সুব্রত সেনগুপ্ত দ্বিতীয় সংকলনে লিখেছিলেন যে, শিল্পীর ভূমিকা নিছক গল্প শোনানো থেকে বহু দূরে অর্থাৎ তাঁরা নিজেদেরকে গল্পকার না ভেবে শিল্পী ভাবতেই পছন্দ করতেন। সাফল্য পরিসরের দিক থেকে, জনপ্রিয়তার দিক থেকে সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও কিন্তু তীক্ষ্ণধার একটি স্বতন্ত্র স্রোতকে কখনোই তাঁরা হারিয়ে যেতে দেননি। 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন –

> এই ধারাতেই এসেছেন সুভাষ ঘোষাল, মধুময় পাল, কিছুটা প্রবীণ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রবিশংকর বল, দেবর্ষি সারগী, সমীরণ দাস। এ কথা বলতে চাইছি না যে, শেষোক্ত লেখকেরা শাস্ত্রবিরোধী গল্পধারার অনুগামী। বলতে চাইছি – আখ্যান নির্ভর, পরিণামমুখী, নরনারী-সম্পর্কের বাইরে এসে, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর ভালো লাগার প্রত্যাশা মেটাবার চেষ্টা না করে মনোগহনের উদঘাটনই এই লেখকদের অভিপ্রায়।[৭৫]

এঁদের কয়েকজনের কিছু গল্প ধরে সেই প্রভাব লক্ষ করা যাক। যেমন, আমরা দেখি দেবর্ষি সারগীর 'আত্মহত্যা' (১৯৮৮) গল্পটি আসলে একটি খুনের গল্প। দীনু, নারাণ ও তারিণী খুন করছে শ্যামকে অর্থাৎ মানুষ খুন করছে মানুষকে, বা বলা যায় মানুষ খুন করছে নিজেকেই – এই অর্থে গল্পের নাম 'আত্মহত্যা'। এইভাবে 'আত্মহত্যা' শব্দটির অর্থগত এক ভিন্ন পরিসর নির্মাণ করছেন গল্পকার। গল্পের শেষে আমরা দেখি –

> নারাণ যখন শ্যামের মাথার কাছে এসে কুড়োলটা উঁচু করে ধরে, শ্যাম গামছা বাঁধা মুখের ভেতর দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে চাইল, নারাণ থামো থামো! নিজেকে হত্যা কেন করছ গো?"[৭৬]

গল্পটিতে এই খুনের ঘটনাটি ছাড়া আর কোনো ঘটনা নেই; পুরো গল্প জুড়ে চিত্রিত হয়েছে খুন হওয়ার আগে নদীর ধারে মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা শ্যামের মানস-জগতের ছবি। কখনো সে ভাবছে বউয়ের কথা, কখনো সাত বছর বয়সী মেয়ের কথা – "বউয়ের তো বয়স বেশি নয়, শ্যাম ভাবছিল, সে কি আবার বিয়ে করে নেবে। নাকি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে। ভাল রাঁধত, চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটা তিল, লাল শাড়িতে খুব সুন্দর দেখায়। ... পুতুলের কী হবে। পুতুলের ঠোঁটের নিচে সাত বছরের মিষ্টি চিবুক। ওর মাথায় সাত বছরের চুল। চোখে সাত বছরের চাউনি। ওর সাত বছরের শ্যামলা নরম পায়ের পাতায় পরশু আলতা মাখিয়ে দিয়েছিল।"[৭৭] এর পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে খুন করার আগে খুনিদের মানসজগতের ছবি।

আবার 'খুনি' (২০০১) গল্পে লেখক স্পষ্টই বলেছিলেন, "খুন করার পর খুনির জীবন আর স্বাভাবিক থাকতেই পারে না। তার মস্তিষ্কের গভীরে যেন কোনও স্থায়ী অঙ্গহানি হয়ে যায়। সে হয়ত ভাবে তার ইচ্ছার পূরণ ঘটেছে, তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে। সাময়িকভাবে এরকম মনে হতেই পারে। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে যায় খুনের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। এটা স্বাভাবিক, কারণ প্রতিটি খুনই তো প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"[৭৮] এই গল্পেই লেখক আরও বলেছেন, "একটা খুন হওয়া মানে দুটো খুন হওয়া, কারণ অন্যকে খুন করার পরের মুহূর্ত থেকে খুনি নিজেকেও খুন করা শুরু করে। সে আর আগের মতো স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে না। আগের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না। হাঁটার সময় তাকে মাঝেমাঝেই পেছন ফিরে তাকাতে হয়। শুধু তার নিজেকে খুন করার প্রক্রিয়াটা একটু দীর্ঘ। নিজেকে সে খুন করে তিলতিল করে। এই যুক্তিতে, যে খুন হল তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টে মারা যায় যে খুন করল সে।"[৭৯] উল্লেখ্য, এই গল্পটিতে আমরা দেখি গল্পের ভেতরে গল্প। গল্পের কথক ছাড়াও, ভেতরের সেই গল্পে একজন গল্পকার আছেন, যিনি গল্প বলেন গল্পটি জুড়ে। গল্পের শুরুটি এমন – "এরপর সবাই গল্পকারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করল খুনিদের সম্পর্কে কিছু বলতে। গল্পকার বললেন..."।[৮০] ঠিক এই ধরণের আরম্ভ আমরা পাই দেবর্ষির 'জাতিদাঙ্গা' (২০০১) গল্পেও – "এরপর সবাই গল্পকারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করল জাতিদাঙ্গা সম্পর্কে কিছু বলতে। গল্পকার বললেন..."।[৮১]

তাঁর 'স্বপ্নভ্রমণ' (২০০১) গল্পে আমরা দেখি কথকের ঠাকুরদা এক স্বপ্নজগতের সন্ধানে বেরোন নাতিকে নিয়ে, যেখানে গেলে এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ করা যাবে – "জীবনে আর কোনও কাজেই বা কোনও সাফল্যেই নাকি ওরকম আনন্দ পাওয়া যায় না। এ কারণেই আনন্দটা অদ্ভুত।"[৮২] স্বপ্ন, আশা, কল্পনা সবকিছু ছুঁয়ে থাকলেও গল্পটি বাস্তবের মাটি ছাড়া হয়নি কখনই। শেষপর্যন্ত লেখক এই উপলব্ধিতে পাঠককে নিয়ে যান, "অদ্ভুত আনন্দটা পেতে এখানে আর না থাকলেও চলবে। ওটা বাড়িতে থেকেও পেতে পারি। বা পৃথিবীর যে কোনও জায়গায়।"[৮৩]

আবার তাঁর 'যখন আমি ও বোন খুব সুখী ছিলাম' (১৯৯২) গল্পটিকে দু'টি পৃথক অবতলে পড়া যেতে পারে। উপরিতলে গল্পটিতে একটি কাহিনি অবশ্যই আছে, যেখানে আমরা দেখি কথক ও তার বোন তাদের শৈশবকালে বিক্রি করে দেওয়া পুরনো বাড়িতে গিয়েছে এবং সেখানে গিয়ে তারা সারারাত ধরে শৈশবে যা যা করত তা করা শুরু করে, এমনকী ভাই-বোন মিলে ঘোড়া-ঘোড়া খেলে, কথক হাঁটু মুড়ে বসে ঘোড়া হয় এবং

কথকের বোন পিঠে চেপে বসে, তারা হাসে-কাঁদে, সকালে কথকের বোনের মুখে আমরা শুনি "আমরা কিন্তু সারারাত খুব মজা করেছি। একটুও ঘুমোইনি।"[৮৪] কিন্তু এইসব আপাত ছেলেখেলার আড়ালে লেখক উপস্থাপন করেন তাঁর দার্শনিক মতটিকে, "একেবারে গভীরতম অতীতে যদি যেতে পারত অর্থাৎ একেবারে উৎসে, যেখান থেকে আমরা সবাই যাত্রা শুরু করেছি, তাহলে আর কাঁদত না। কিন্তু যা মজার, সেখানে যেতে হলেও হাঁটতে হবে সামনের দিকে, পেছনদিকে নয়। তাতেও একদিন পৌঁছবে, কারণ যাত্রাটা যে বৃত্তাকার।"[৮৫]

একইভাবে আমরা তাঁর 'ছুটির দুপুর, বিকেল ও রাত' (১৯৯২) গল্পটিতেও দেখি গল্পকার তাঁর দার্শনিক মতামত প্রকাশ করেছেন গল্পের চরিত্রদের মাধ্যমে। গল্পটি আপাতভাবে শীতের এক ছুটির দিনে দুই মাঝবয়সী বন্ধুর শহর ঘুরে বেড়ানোর গল্প হলেও, নিছকই তা নয়। গল্পের শেষদিকে আমরা দেখি কথকের বন্ধু এক অন্ধকার ঝোপের ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় কথক তাঁকে খুঁজে পান না এবং কথক অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করার পরে সে সাড়া দেয়। কথক তাঁকে দেরি করে সাড়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, "বেড়ানোর শেষে সবাই তো আবার মায়ের গর্ভেই ফিরে যায়। এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমি সেই কথাই ভাবছি। আর মনে মনে সেখানে ফিরে যাবার রোমাঞ্চ অনুভব করছি। আমি ক্লান্ত, বন্ধু!"[৮৬] এরপর কথকের বাচনে আমরা শুনি, "এক মুহূর্তের জন্যও ধড়াস করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা, কিছুক্ষণ নিদারুণ দিশেহারা লাগল নিজেকে, তারপর আজ এই প্রথম বন্ধুকে খুব বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হতে লাগল। এবং ওর প্রতি এই মুহূর্তে যেরকম ঈর্ষা হচ্ছিল, এর আগে সেটাও কখনও অনুভব করিনি। একাই যাচ্ছ বন্ধু? কাতর, অভিমানী গলায় আমি চেঁচালাম। আমাকে সঙ্গে নেবে না?"[৮৭]

আবার তাঁর 'দাঙ্গা' (১৯৯৫) গল্পটি আমাদেরকে বিস্মিত করে চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে। আধুনিক মানুষের মনোবিকলনের চিত্রকে যেভাবে অঙ্কন করেছেন লেখক, তা লোমহর্ষক। তাঁর 'ভোট' গল্পেও দেখি ভোটে জেতার জন্য দলেরই এক তরুণকে খুন করানো হয় এবং বিরোধীদলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে জনগণের সহানুভূতি আদায় করা হয়। ভোটের পরে কথকের স্বীকারোক্তি – "নির্বাচন হল। আমি জিতলাম চার হাজার ভোটের ব্যবধানে। ছেলেটাকে খুন না করলে এর অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে হারতাম।"[৮৮] গল্পের শেষে আমরা দেখি, অন্য কেউ দেখতে না পেলেও কথক সেই মৃত ছেলেটিকে দেখতে পান ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে, যা কথককে উন্মত্ত করে তোলে।

আবার 'আমি কথা রেখেছি' গল্পের কথক আসলে একজন মৃত ব্যক্তি, যে তার প্রেমিকাকে কথা দিয়েছিল কখনও সে তাকে ছেড়ে যাবে না। আর তাই দাঙ্গাতে তার মৃত্যু হলেও, সে প্রেমিকাকে ছেড়ে যায়নি, সে যেভাবে কথা রেখেছে তা কথকের বয়ানে – "রেহানাকে যে আমি কথা দিয়েছি ওকে ছেড়ে কখনও কোথাও যাব না। আমি কথা রেখেছি। ওকে ছেড়ে কোথাও চলে যাইনি। এখানকার বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়াই। শ্রাবণের ভিজে সন্ধেয় কিংবা মাঘের দুরন্ত দুপুরে। কিংবা চিলের ডাকের ধাক্কায় পাক খাওয়া শনশন ঢেউয়ে। আর আছড়াতে থাকি জানলা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রেহানার শরীর ও মনে।"[৮৯]

এবার আসা যাক রবিশংকর বলের গল্প আলোচনায়। তিনি আশির দশকে লেখা শুরু করে নব্বইয়ের দশক থেকে ক্রমশ বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রধান গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন; 'মধ্যরাত্রির জীবনী' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর 'নির্বাচিত গল্প'-এর ভূমিকায় দিব্যেন্দু পালিত বলেছেন,

> ইতিমধ্যে প্রকাশিত রবিশংকরের 'দারুনিরঞ্জন', 'ওই মণিময়, তার কাহিনী', 'জীবন অন্যত্র', 'আর্তোর শেষ অভিনয়' ইত্যাদি গ্রন্থের গল্প ও আরও অন্যান্য গল্প যাঁরা সম্পূর্ণভাবে পড়ে উঠতে পারেননি, 'নির্বাচিত গল্প' শীর্ষক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত একত্রিশটি গল্প ধারাবাহিক পাঠের পর তাঁরা বুঝতে পারবেন গল্পকার রবিশংকর তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে কেন আলাদা, কতটা আলাদা, কীভাবে আলাদা – গল্প ও কাহিনির মধ্যে তিনি পার্থক্য করেন কোন তাৎপর্যে পৌঁছতে, বাস্তব ও পরাবাস্তব কতদূর সাবলীলতায় জায়গা বদল করে তাঁর রচনায়, কোথায় তিনি ছুঁয়ে যান উত্তর-আধুনিক সংজ্ঞা, কিংবা কীভাবে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ও জীবনানন্দ দাশ আসঙ্গ হয়ে ওঠেন তাঁর গল্পে।[৯০]

নিছক গল্প বানান না তিনি। তাঁর 'কাঞ্চন বনাম রঞ্জু' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয়ের শিল্প-প্রতীতি হিসেবে গল্পকারের নিজস্ব প্রত্যয়ই উপস্থাপিত হয় – "শুধু কাহিনির বর্ণনার জন্য একটি লেখা সংবাদ ফিচারের বেশি কিছু নয়।"[৯১] এই গল্পটির মূল থিম হল শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং তাতে স্রষ্টার ভূমিকা। এখানে উঠে এসেছে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তব ও সত্যের পার্থক্য এবং বাস্তবের রূপান্তরীকরণে স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে জটিলতর প্রশ্ন। 'বিনয়দা উপন্যাসটার সব ঘটনাই কি একেবারে সত্যি?' – রঞ্জুর এই সরাসরি প্রশ্ন থেকেই উঠে আসে বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের জটিল সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নটি। গল্পের শেষে আমরা দেখি,

'ট্রেনের জানলার পাশে বসে ভাবছিল বিনয়। শিল্পের ভুবন কীরকম জীবনের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে।'[৯২]

আবার একটি 'লেখা' আসলে কী, সে উত্তর গল্পকার খুঁজেছেন 'বিপ্লবীর সোনারুপো' গল্পে। তিনি বলছেন, "এই লেখার নাম অন্ধকারের ভাষ্য। আমি কারোর জন্য এটা লিখছি না। ভবিষ্যতের কোনও পাঠকের জন্যও নয়। এমনকী বাসন্তীকেও পড়াব না আমি এই লেখা। এই লেখার শিরোনামের নিচে বা লেখার শেষে কোনও লেখকের স্বাক্ষর থাকবে না। বাস্তবিক এই লেখা আমি নিজের জন্যও লিখছি না। এখানে আমাকে আমি নির্মাণ করব। পৃথিবীতে খুব কম লেখা আছে যা আসলে নিজেকে নির্মাণ করা। কেননা সব সময়েই লেখার কোনও গ্রাহকের কথা ভাবা হয়েছে যার জন্য কেউ লেখে। স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোসের বীজটি থাকে এখানেই।"[৯৩]

শাস্ত্রবিরোধীদের মতো রবিশংকর বলও মনে করেন আমাদের জীবন গল্পের মতো কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ ঘটনাবলি নয়। 'মধ্যরাত্রির জীবনী' গল্পে দেখি বিতান হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসে, "চাকরিটা কেন সে ছেড়ে দিল, সেই কারণটাও তো তার কাছে স্বচ্ছ নয়, অর্থাৎ কারুর কাছে গুছিয়ে বলবার মত যুক্তিপরম্পরাও তার ভাঁড়ারে নেই। তবু চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তার নিজেকে বেশ বিজেতার মত মনে হয়েছিল, যেন টিলায় উঠে সূর্যোদয় দেখার মত, যেহেতু আঠাশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। এর আগে দুবার বিভিন্ন কারণে তাকে কোম্পানি থেকে শো-কজ করা হয়েছিল। দুটি চিঠিরই বয়ানের একটি অভিন্নতা তার মনে আছে, য়ু হ্যাভ ডেভলপড আ মোড অব ইররেসপনসিবিলিটি...।"[৯৪]

এছাড়াও তাঁর গল্প চিত্রকল্প, যতিচিহ্ন, টাইপোগ্রাফি ইত্যাদির প্রয়োগে শাস্ত্রবিরোধীদের উত্তরাধিকারের চিহ্ন বহন করে। লাইটপোস্টের হলুদ আলোকে তাঁর মনে হয় 'যেন নক্ষত্রদের মড়াটে ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি।'[৯৫] আবার কোথাও তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দটিকে ভেঙে মাঝে 'ড্যাশ' চিহ্ন দিয়ে জুড়ে শব্দটিকে টেনে বাড়ানোর দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা তৈরি করা হয়েছে -

> নীহারিকার ফ্যাসফ্যাসে গলা। নতুন বাড়িটা শুধু আমার চাওয়া নয় –
>
> তাহলে কী মা? বিতান নীহারিকার পিঠে তার থাবা মেলে দেয়।
>
> অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারে না নীহারিকা। তারপর একটা শব্দ তার মুখ থেকে ছড়িয়ে যায়, আ–কা– ংং–খা–[৯৬]

আবার 'দারুনিরঞ্জন' গল্পের প্রথম বাক্যটি বোল্ড হরফে লেখা। এই গল্পে লেখক বলছেন, "এই জীবন অন্যত্র, অন্য ভাবে লিপিকরণের জন্য যা হয়তো প্রাচীন সব শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে, যাদের অর্থ এখন আর বোঝা যায় না। কোনওদিন বোঝা যাবে, কোনও মহাপ্রলয়ের পর, ধ্বংসাবশেষ হিসেবে যখন এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হবে, তখন, অনেক সময়ের শূন্যতা পেরিয়ে শব্দরা পুনর্জীবন ফিরে পায়।"[৯৭] আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারীরা কীভাবে পুরনো শব্দের নতুন অর্থগত ডাইমেনশনগুলিকে ধরতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়াও এই গল্পে আমরা দেখি রিলকে, অ্যাপলিন ও বিনয় মজুমদারের কবিতার অংশ মণিময়ের লেখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেবর্ষির মতোই রবিশংকর বলের গল্পেও আমরা দেখি, গল্পকার তাঁর নিজস্ব মতামত, দার্শনিক অবস্থান, ব্যক্তিগত উপলব্ধিগুলিকে অকপটে তুলে ধরেছেন এক একটি গল্পে। ষাট-সত্তরের সাহিত্য-আন্দোলনকারীদের মতোই তিনিও মনে করেন "গল্পের কাছেও আজ যারা নীতি দাবি করে, তাদের কোনওরকম স্বাধীনতা চাওয়ার অধিকার নেই।"[৯৮] আবার ভাষা প্রসঙ্গে 'আগুন ও ছাই' গল্পে তিনি বলছেন, "সত্য উচ্চারণ আসলে বিদ্যুচ্চমকের মতো – সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র, এবং তার কোনও ব্যাখ্যা হয় না।"[৯৯] গল্প হয়ে ওঠাকে তিনি মনে করেন একটি 'অ্যাকসিডেন্ট'; কোনো সাজানো পরিকল্পিত ব্যাপার নয় -

> হয়তো একটা গল্প সে শুরু করে, কিন্তু সেই গল্পের কোনও কথার সূত্র ধরে চলে যায় অন্য গল্পে – তারও পরে অন্য আর একটি গল্পে – এভাবে পিনাকীর মূল গল্প কতদিন হারিয়ে গেছে। অনুপমদের শোনা হয়নি। 'মূল গল্পটা কোথায় গেল?' তারা জিগ্যেস করলে পিনাকী উত্তর দিয়েছে, 'ছিল নাকি? মূল গল্প বলে কিছু থাকে নাকি?'
>
> 'তাহলে গাছের বীজটা কী?'
>
> 'কিন্তু বীজের আগে?' পিনাকী হেসেছে, 'সেই তো গাছ। তার আগে? হাঃ – হাঃ–'
>
> 'কিন্তু শুরু বলে তো একটা কিছু থাকে।'
>
> 'সেটা অ্যাকসিডেন্ট।'[১০০]

শাস্ত্রবিরোধীদের মতোই রবিশংকরও সর্বজ্ঞ কথকের অস্তিত্বকে পুরোপুরি অবাস্তব সাব্যস্ত করে নাকচ করে দিতে চান। তাই তাঁর গল্পের কথক বলে, "আমি তো তোমাদের সবজান্তা লেখকদের মতো নই যে ঈশ্বর হয়ে তখন স্মরজিত-বিদিশার মাঝখানে লুকিয়ে

থাকব।"[১০১] আবার কখনো গল্পকার শ্রুতি কবিদের মতো আত্মনিমগ্ন হয়ে পৌঁছে যান এমন উপলব্ধিতে যে, "প্রেম আসলে অন্ধকার ও শূন্যতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।"[১০২]

এছাড়া উল্লেখ করা যেতে পারে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটি সাক্ষাৎকারের কথা, যেখানে তিনি জানিয়েছেন তিনি এবং তাঁর সমকালের লেখকেরা এই আন্দোলনগুলির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন –

> স্বীকার করি বা না করি প্রভাব একটা থাকে এবং আছেও। সমাজ এবং সাহিত্য তো এক একটা স্রোত। সাহিত্য কিন্তু একটা ইতিহাসকে বহন করে। মূলনদী যেমন তার উপনদী-শাখানদী ইত্যাদি নিয়ে পরিপুষ্ট হয়, সাহিত্যও তেমনি। কখনও কখনও মূলধারার সাহিত্যে নতুন ধরনের একটি সৃষ্টি এসে মিশে যায়, কখনও বা মূলধারা থেকেই বেরিয়ে যায় একটি ভিন্ন স্রোত; আবার কখনও সমান্তরাল একটি প্রবাহ! অর্থাৎ সাহিত্যেরও এভাবে পরিপুষ্টি ঘটে। ... সুব্রত সেনগুপ্ত - অমল চন্দ – আশিস ঘোষ – বলরাম বসাক – শেখর বসু – সুনীল জানা এবং অবশ্যই রমানাথ রায় – ছয়ের দশকে নতুন ভাবে গল্প বলার সাহস দেখিয়েছিলেন বলে সত্তরের গল্পে একটা পরিবর্তন এসেছিল। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি সামনে না থাকলে পরবর্তী সময়ের গল্পগুলি ঘটনাকেন্দ্রিক হয়েও একটু অন্যরকম হয়ে উঠতে পারত না বোধ হয়। সাতের দশক থেকে বাংলা গল্পে একধরনের ডক্যুমেন্টেশন ঢুকল, হিপোক্রাট ঢুকল, শুধু একটা সলিলকিতে গল্প বলা হল। এই ধরনের যে এক্সপেরিমেন্টগুলো করলেন লেখকরা, তার পিছনে শাস্ত্রবিরোধীদের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। তাঁরা প্রথা ভেঙেছিলেন বলেই আমরা আমাদের মতো করে অন্যরকম কিছু লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। আমরা তো তারাশঙ্কর – মানিক কিংবা সমরেশ বসুর অন্ধ অনুকরণ করিনি। আমাদের একটু আগে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন, আমরা তাঁদের পাঠক ছিলাম। কিন্তু আমার বা আমার সমসাময়িক বন্ধুদের লেখা তো বরেন – শীর্ষেন্দুর মতো হয়নি। একটু অন্যরকম হয়েছে। এখানে অবশ্যই শাস্ত্রবিরোধীদের প্রভাব রয়েছে।[১০৩]

বর্তমানে আন্দোলনগুলি নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন –

> সময়ের নিয়মে আন্দোলন থেমে গেছে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার প্রভাব যেহেতু স্পষ্ট, তাই আলোচনাটাও প্রাসঙ্গিক। এই সময়ের গল্পে একটা পুরো প্রবন্ধ ঢোকানোর সাহস দেখাচ্ছেন লেখক, কেউ গল্পের মধ্যে একটা ফিলোজফিক স্টেটমেন্ট রাখছেন। বিদেশে যাঁরা ফিকশন রাইটার তাঁরা এমনটা করেই থাকেন। কিন্তু এ দেশে তারাশঙ্কর – বিভূতিভূষণরা তো তা করতেন না, সুনীল তো করতেনই না; একমুখী গল্পই বলতেন। যাইহোক, অনেক বছর পর আজও যেমন জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে আলোচনা হয়, ত্রৈলোক্যনাথ – অক্ষয় দত্ত

আলোচনায় উঠে আসেন, হাংরি গল্পকার বাসুদেব দাশগুপ্তকে নিয়ে আলোচনা করেন বাংলা সাহিত্যের সমঝদার পাঠক-সমালোচক-সম্পাদক, তেমনই শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররাও আলোচিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। নিজেদের যোগ্যতাতেই তাঁরা আলোচিত হচ্ছেন আজকের সময়ে। সর্বোপরি শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন – অপ্রয়োজনীয়, ব্যর্থ, নিষ্ফল – এমনটা তো নয়। তাই আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।[১০৪]

আবার অমর মিত্র স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, তিনি ফর্ম-সচেতন হয়েছেন শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের প্রভাবে। শাস্ত্রবিরোধীরা পরবর্তী গল্পকারদের কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন সে প্রসঙ্গে অমর মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন –

নিশ্চয়ই কিছু না কিছু হয়েছে। যাঁরা খুব সিরিয়াসলি সাহিত্যের কথা ভেবেছেন, পড়াশুনা করে গল্প লিখতে এসেছেন, তাঁরা অবশ্যই নজরে রেখেছিলেন অগ্রজরা কেমন ভাবে লিখেছেন। একালের অনেক লেখকই তো অন্যরকম গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। লিখেছেন এবং লিখছেন। আমি তো অবশ্যই চেষ্টা করেছি। আমি যেমন হাংরি গল্পকারদের লেখা খুব মন দিয়ে পড়েছি, তেমনি শাস্ত্রবিরোধীদেরও। 'এই দশক'-এর সব ক'টা সংখ্যা অবশ্য সংগ্রহ করা হয়নি, তবে অন্যান্য পত্রিকাতে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা যে গল্পগুলি লিখতেন তার বেশিরভাগই পড়েছি। পড়ে বুঝেছি লেখার ফর্ম নিয়ে কত ভাবনাচিন্তা করেছেন এঁরা। আমি অনেক সময় ফর্ম সচেতন হয়েছি এঁদের প্রভাবে। আবার আমার গল্পের ফর্ম বেশিরভাগ সময়েই উঠে এসেছে জীবন থেকে। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি পড়ে বুঝেছিলাম, একটু অন্যরকম ভাবে লেখা যেতেই পারে। যেমন আমার 'দানপত্র' গল্পটি পুরোটা দলিলের ফরম্যাটে লেখা। গল্পের বিষয়ে নয়, আঙ্গিকে অবশ্যই হাংরি-শাস্ত্রবিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমাদের কালে গল্পের ফর্ম সম্পর্কে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে সেটা শাস্ত্রবিরোধীদের প্রভাব তো বটেই। গল্পে নতুন নতুন ফর্ম ব্যবহার করার সাহস আমি পেয়েছি মূলত ওঁদের কাছ থেকেই। শাস্ত্রবিরোধী প্রতিফলন কি না জানি না, স্বপ্নময়-নলিনীরাও তো গল্পে গল্পে সফল ভাবে নিজেদের ভেঙে চলেছেন। আমরা কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র – কমলকুমার মজুমদার – সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় – শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়দেরও মাথায় রেখেছি।[১০৫]

শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে গল্পের চর্চাকে যে অনেক ব্যাপক, গভীর ও নতুন তাৎপর্যমুখী করে তুলেছে – এ-কথা অস্বীকারের উপায় নেই। এই আন্দোলন পরবর্তীকালে আরও অন্যান্য সাহিত্য-আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছে। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের পরে পরেই বাংলায় বেশ কয়েকটি ছোটগল্পকেন্দ্রিক আন্দোলন দেখা দেয় – নিমসাহিত্য (১৯৭০), গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্যবিরোধী গল্প আন্দোলন (১৯৭০), ঘটনাপ্রধান গদ্য (১৯৭০), নতুন নিয়ম (১৯৮১), সমন্বয়ধর্মী গল্প (১৯৭৯), গাণিতিক গল্প (১৯৮০), থার্ড

লিটারেচার (১৯৮৩) ইত্যাদি। প্রতিটি আন্দোলনই গতানুগতিক সাহিত্যের বিরোধী। বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনসমূহ ছোটগল্পকে বহির্বিশ্ব থেকে অন্তর-চেতনার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বস্তুবিশ্বের স্তূপাকার ঘটনাপুঞ্জ নয়, কোনো বিশেষ চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা নয়, প্লটের পারম্পর্যময় শৃঙ্খলা নয়, চৈতন্যের নির্জন সমস্যাকেই এঁরা সাহিত্যের বিষয় করেছেন। কেবল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই নয়, ছোটগল্পের পরে উপন্যাসের ছাঁচও ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন কেউ কেউ। 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক অমল চন্দের স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন –

> একদিন আমার বাড়িতে এসে বললেন – শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে গল্পের ছাঁচ অনেকটাই বদলে দিয়েছি আমরা। এ বার উপন্যাসের ছাঁচ ভাঙতে হবে – 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো' আন্দোলন শুরু করতে হবে। আপনার 'সে সে' উপন্যাসে সে-কাজ শুরু হয়েছে আগে থেকেই, এবার আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। এই কাজে আরও তিনজনকে পেয়েছি – অমল দত্ত, তাপস চৌধুরী, আশিস মুখোপাধ্যায়। ওদের মধ্যে ওই ধরণ অনেকটাই আছে।[১০৬]

অমল চন্দ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অভিযোগ'-এর ভূমিকায় একে 'প্রথম শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাস' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, "মনে রাখতে হবে, এটা শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাসের নমুনা নয়। সাহিত্যের কোন নমুনা হয় না, একথা আমি অনেক প্রবন্ধে বার বার বলেছি। কিন্তু আমি দেখেছি, কিছু পাঠক এবং কোন কোন লেখকও আমার কোন কোন গল্পের আঙ্গিককে শাস্ত্রবিরোধিতার নমুনা হিসেবে ধরে নিয়েছেন বা ব্যবহার করেছেন। এভাবে শাস্ত্রবিরোধিতা হয় না, নতুন শাস্ত্র গজিয়ে ওঠে, শাস্ত্রবিরোধী লেখকের হাতে গোপন শেকল উঠে আসে, পাঠকের মধ্যে নতুন করে জাড্য দেখা দেয়। কিন্তু আর সময় নেই, চোখ খোলা রাখুন, যাতে সব কিছু একের পর এক দেখে যেতে পারেন। কান পেতে রাখুন, যাতে সব কথা একের পর এক শুনে যেতে পারেন।"[১০৭] এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয়ের সম্পর্কে লেখক জবাবদিহি করেছেন এভাবে, "বিনয়ের রাজনীতি নেই ধর্মনীতি নেই দার্শনিকতা নেই সমাজনীতি নেই পাপ-পুণ্য নেই বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই নেই, বিনয় মহৎ নয় আঞ্চলিক নয় নাগরিক নয় জীবনবাদী নয় যৌবনবাদী নয় আশাবাদী নয় নৈরাশ্যবাদী নয় বাস্তববাদী নয় অবাস্তববাদী নয়, সে এসব কিছুই নয়। তাহলে সে কি করে উপন্যাসের নায়ক হবে? বিনয় যদি আর পাঁচজনের মত পাঁচটা কাজে চৌকস হতে পারত তাহলেও হত। যার কোন বীরত্ব নেই মহত্ব নেই শৌর্য্য নেই বীর্য্য নেই ধৈর্য্য নেই বিদ্রোহ নেই তার

তো কোন যাত্রার দলেই জায়গা হবে না। সে কি করে বাংলা উপন্যাসের নায়ক হবে? এক লাখ নায়কের মিছিলের সামনে দাঁড়িয়েছে আমার বিনয়, একা, পথরোধ করে।"[১০৮]

উক্ত আলোচনা থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ষাট-সত্তর দশকের এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে প্রতিষ্ঠান যতই অস্বীকার করুক না কেন, বাংলা সাহিত্যের ধারায় হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী এই তিনটি সাহিত্য-আন্দোলনের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন বাংলা ছোটগল্পের অন্তঃস্রোত' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সময়ের নিয়মেই থেমে গেছে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। যে কোনও ভাষার যে কোনও সাহিত্য আন্দোলনের মতোই কালের গণ্ডি পেরিয়ে এ কথা স্বীকার করতেই হবে পাঠকের ঔদাসীন্য, গতানুগতিক গোল গল্পের রমরমা, প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা সম্পাদকদের উন্নাসিকতা এবং প্রতিষ্ঠানের অল্পবিস্তর চোখ রাঙানিতে নিজেদের সময়ে শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সত্য মূল্যায়ন হয়নি। যে হাংরি জেনারেশনকে নিয়ে একসময় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান তো বটেই, সমাজের প্রতিষ্ঠানও গেল গেল রব তুলেছিল, সেই হাংরি সাহিত্য এখন নাম করা প্রতিষ্ঠানের তকমা পরে দিব্যি বিকোচ্ছে। কোনও সাহিত্যসেবা অথবা ব্যক্তিগত পক্ষপাতে নয়, আসলে প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে এসেছে কারণ এই হারিয়ে যেতে বসা সাহিত্যগুলি নিয়ে নানা স্তরের পাঠক মহলে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ষাট-সত্তরের বাংলা সাহিত্য শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের জোরদার ধাক্কায় এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছিল বাংলা ছোটগল্পে। পরবর্তী সময়ে যখনই সাহিত্য ব্যাপক পরিবর্তনের সামনে দাঁড়াবে, সেই অভিজ্ঞতাকে সে কখনওই অস্বীকার করতে পারবে না।"[১০৯] এই সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে অস্বীকার করলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় একটি মিসিং লিঙ্ক থেকে যায় অনিবার্যভাবেই; প্রতিষ্ঠান যতই এদেরকে অস্বীকার করুক, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক, বিরূপ সমালোচনা করুক, এমনকী থানা-পুলিশ করে আন্দোলনের কফিনে শেষ পেরেকটা গেঁথে দিক, সমাপ্তি বা ব্যর্থতা ঘোষণা করুক, কিংবা সাধারণ পাঠক ভুলতে বসুক।

তথ্যসূত্র

১। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 'হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন, শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', কলকাতা-৭৩ : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮২-৮৩।

২। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবিতীর্থ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ৩৮ তম বর্ষ, বর্ষা ১৪২৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১২৪।

৩। শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দ ও সত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ, শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.২৫৮।

৪। হেনরি মিলার, 'সমাজ কবি কবিতা', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৫৫।

৫। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.৪৭৯।

৬। তদেব, পৃ.৩২৫।

৭। তদেব, পৃ.১১৬-১১৭।

৮। তদেব, পৃ.১১৭।

৯। তদেব, পৃ.৪৫৪।

১০। তদেব, পৃ.১৫১।

১১। তদেব, পৃ.৪৫১।

১২। দেবেশ রায় 'বিলম্বিত সাওয়াল', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ১৭৬।

১৩। নির্মল হালদার, 'আমি ছোটো নই', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.৫৩৫।

১৪। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.১৪৯।

১৫। অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, পদ্যপত্র পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ.৪১।

১৬। সুভাষ কুণ্ডু, 'হাংরি রচনা ধর্ম না অশ্লীলতা?' প্রবন্ধ, শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.১৪৫।

১৭। শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকার, শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৭৮।

১৮। নির্মল হালদার, 'প্রাতিষ্ঠানিক কবি ও লেখকদের', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ.৫৩৫।

১৯। সমরেশ বসু, প্রজাপতি, কলকাতা-০৯ : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮, 'আমার কথা' শীর্ষক ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা অনুল্লিখিত।

২০। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৭৫।

২১। তদেব, পৃ.৪৭৬।

২২। স্বপনরঞ্জন হালদার, প্রকাশ্য দিবালোকে পাকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফটাফট কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছিল যে যুবতী পাগলিটা, ৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯ : ডানা, বইমেলা ২০১২, পৃ. ৭।

২৩। নবারুণ ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা-৭৩ : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৯।

২৪। সুবল সামন্ত সম্পাদিত, বাংলা গল্প ও গল্পকার, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা -৭৩ : এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১০, পৃ. ১২৫।

২৫। ঐ।

২৬। ঐ।

২৭। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ২৯-৩০।

২৮। বিশ্বরূপ দে সরকার সম্পাদিত, 'মধ্যবর্তী', উৎসব সংখ্যা, নব পর্যায়, বর্ষ ৩০, বালুরঘাট, অক্টোবর ২০১৯, পৃ.৩।

২৯। বিশ্বরূপ দে সরকার সম্পাদিত, 'মধ্যবর্তী', উৎসব সংখ্যা, বালুরঘাট, ২০১৭, পৃ. ৫।

৩০। অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, পদ্যপত্র পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৪৫।

৩১। রমানাথ রায়, 'রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.১০১।

৩২। অরুণকুমার ঘোষ, 'শ্রুতি : একটি কবিতাপত্র : একটি আন্দোলনের প্রয়াস' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.৬৪।

৩৩। ঐ।

৩৪। অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.৪০।

৩৫। তদেব, ৪২।

৩৬। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রুতি : ফিরে দেখা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.৮৩-৮৪।

৩৭। প্রবালকুমার বসু, 'সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, এক কিশোর ও শ্রুতি আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.২২৮-২২৯।

৩৮। সত্য গুহ, 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল'

৩৯। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রুতি : ফিরে দেখা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.৮৩-৮৪।

৪০। রমানাথ রায়, 'রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ. ১০১।

৪১। সুমিতা চক্রবর্তী, 'ষাট দশকের বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ, কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিশ শতকের কবিতা ভাবনা, কলকাতা-৯০ : শিলীন্ধ্র প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯।

৪২। তদেব, পৃ. ১৯০-১৯১।

৪৩। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা-০৯ : অভিযান পাবলিশার্স, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৪২।

৪৪। রমানাথ রায়, 'রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ. ১০১।

৪৫। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, '৭০ থেকে ৯০-এর কবিতার বাঁকবদল ও তার উপাদান' প্রবন্ধ, কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'বিশ শতকের কবিতা ভাবনা', পৃ. ২৩৮।

৪৬। অরুণকুমার ঘোষ, 'শ্রুতি : একটি কবিতাপত্র : একটি আন্দোলনের প্রয়াস' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ.৬৪।

৪৭। সুজিত সরকার, 'অপরূপ ভাষাচিত্র : মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ. ৩০২।

৪৮। রত্নেশ্বর হাজরা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা-৭৩ : প্রমা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১০, পৃ.৪৮।

৪৯। প্রভাত চৌধুরী, 'শ্রুতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পৃ. ৭৩।

৫০। অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, কলকাতা-০৬ অরুণা প্রকাশনী, নবম মুদ্রণ মাঘ, ১৪১৯, পৃ.২৭।

৫১। অলোক রায় সম্পাদিত, গল্প আঠারো, কলকাতা-৭৩ : মডেল পাবলিশিং হউস, ভূমিকা অংশ।

৫২। দেবর্ষি সারগী, 'বাংলা ছোটগল্পের বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

৫৩। ঐ।

৫৪। প্রভাতকুমার দাস, 'অনুভূতির জগতের বাস্তবতা শেখর বসুর গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, বাংলা গল্প ও গল্পকার, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশায়েরা, পৃ. ১৭১।

৫৫। শেখর বসু, 'লেখা ও লেখক', কলকাতা-৭৩ : এবং মুশায়েরা, পৃ. ১০১।

৫৬। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এই দশক এবং বলরাম বসাকের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪১৯-৪২০।

৫৭। অলোক রায়, 'আশিস ঘোষের শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ.৩৭৮।

৫৮। সুমিতা চক্রবর্তী, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪০৩।

৫৯। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনের গল্প', কলকাতা-৭৩ : এবং মুশায়েরা, পৃ. ৫।

৬০। দেবেশ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৩৪৫।

৬১। ঐ।

৬২। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এই দশক এবং বলরাম বসাকের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪২৬-৪২৭।

৬৩। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা-০৯ : নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯, পৃ. ১৩৬।

৬৪। ঐ।

৬৫। অবন্তীকুমার সান্যাল, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, কলকাতা-০৯ : প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২।

৬৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'ছোটগল্প ১' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পঞ্চাশৎ পরিক্রমা' গ্রন্থ, পৃ. ৮৪-৮৫।

৬৭। অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা – ০৯ : করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৪ ।

৬৮। গোপা দত্তভৌমিক, 'ছকভাঙা গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৩৭৩।

৬৯। রমানাথ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা', ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮ : ইসক্রা, জুন ২০১৪, পৃ. ১৯ ।

৭০। এই দশক, ঊনবিংশ সংকলন, কলকাতা-০৬, ১৩৮১, পৃ. ৩৫।

৭১। তদেব, পৃ. ৩৬।

৭২। দেবেশ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৩৩৮।

৭৩। রবিন পাল, 'দেবর্ষি সারগীর গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, সুবল সামন্ত সম্পাদিত, বাংলা গল্প ও গল্পকার, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশায়েরা, ১৫০-১৫১।

৭৪। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪১২-৪১৩।

৭৫। সুমিতা চক্রবর্তী, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৩৯৯-৪০০।

৭৬। দেবর্ষি সারগী, নির্বাচিত গল্প, কলকাতা-৯ : করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৫, পৃ. ১৮।

৭৭। তদেব, পৃ. ১২-১৩।

৭৮। তদেব, পৃ. ৭৭।

৭৯। তদেব, পৃ. ৭৪।

৮০। ঐ।

৮১। তদেব, পৃ. ৮১।

৮২। তদেব, পৃ. ২০।

৮৩। তদেব, পৃ. ২৩।

৮৪। তদেব, পৃ. ৩৮।

৮৫। ঐ।

৮৬। তদেব, পৃ. ৯৯।

৮৭। ঐ।

৮৮। তদেব, পৃ. ১০৫।

৮৯। তদেব, পৃ. ১১০।

৯০। রবিশংকর বল, নির্বাচিত গল্প, কলকাতা-৯ : করুণা প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৮।

৯১। তদেব, পৃ. ১২।

৯২। তদেব, পৃ. ১৪-১৫।

৯৩। তদেব, পৃ. ২০।

৯৪। তদেব, পৃ. ২৫।

৯৫। তদেব, পৃ. ২৭।

৯৬। তদেব, পৃ. ২৮।

৯৭। তদেব, পৃ. ৬৮।

৯৮। তদেব, পৃ. ১৭০।

৯৯। তদেব, পৃ. ১৬৪।

১০০। তদেব, পৃ. ১৬৮।

১০১। ঐ।

১০২। তদেব, পৃ. ১৪৪।

১০৩। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪৩৬-৪৩৭।

১০৪। তদেব, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮।

১০৫। তদেব, পৃ. ৪৩৯।

১০৬। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪১৬।

১০৭। অমল চন্দ, অমল চন্দের রচনাসংগ্রহ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা – ৭৪৩৩০২ : মহাদিগন্ত, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১০।

১০৮। ঐ।

১০৯। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ.২৮।